সুচিত্রা স্পেশ্যাল

বেঙ্গল টাইমস

১৭ জানুয়ারি, ২০২৬

যে জন ছিলেন নির্জনে

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সূচিপত্র

বন্ধুত্বের শুরুই হয়েছিল ঝগড়া দিয়ে
❑ অমিতাভ চৌধুরি

ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় কাকেই বা মানাত!
❑ স্বরূপ গোস্বামী

গাড়ি থেকে নেমে এলেন সুচিত্রা সেন
❑ তুষার প্রধান

তার ছিঁড়ে গেছে কবে
❑ বিপ্লব মিশ্র

ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সত্যজিৎকেও
❑ ধীমান সাহা

ওয়ান অ্যান্ড ওনলি সুচিত্রা সেন
❑ সরল বিশ্বাস

একটা উত্তম কুমার ছিলেন, তাই উতরে গেছেন
❑ নন্দ ঘোষ

প্রথম ছবির মুক্তি বাইশ বছর পর!
❑ অভিরূপ অধিকারী

বন্ধুকে বাঁচাতে গানও গেয়েছিলেন
❑ স্বনাম গুপ্ত

ছিঁড়ে ফেললেন সৌমিত্রর জামা
❑ প্রশান্ত বসু

স্বপন যদি মধুর এমন!
❑ স্বরূপ গোস্বামী

ISSN 24455657

bengaltimes.in

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

নায়িকা সংবাদ

কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় একটা কথা খুব চালু আছে। একজন লেখকের আসল জন্ম হয় তাঁর মৃত্যুর পর। অর্থাৎ, সেই লেখক মারা যাওয়ার দীর্ঘদিন পরেও যদি তাঁর বই লোকে কেনেন, বারবার তার নতুন নতুন সংস্করণ করতে হয়, তবেই সেই লেখক কালজয়ী লেখক।

শিল্পের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা একইরকম। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে-রা যেমন বেঁচে আছেন, তেমনই বেঁচে আছেন উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেনও। ২০১৪-র ১৭ জানুয়ারি মৃত্যু হয়েছিল সুচিত্রা সেনের। দেখতে দেখতে এগারো বছর হয়ে গেল। এখনও বাঙালি কতটা মনে রেখেছে স্বপ্নের এই মহানায়িকাকে?

উত্তম কুমার মানেই বাঙালি বোঝে জুলাই মাস। আর জুলাই মাস এলেই টিভিতে উত্তমের ছবিতে ছয়লাপ। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে উত্তম সপ্তাহ। অথচ, মহানায়কের জন্ম যে সেপ্টেম্বরে, তা আমবাঙালি তেমন খোঁজ রাখে না। আচ্ছা, সুচিত্রা সেনের জন্মদিন কবে? এই তারিখটা নিয়েও বাঙালির খুব একটা মাথাব্যথা নেই। ৬ এপ্রিল তারিখটা তাই আড়ালেই থেকে যায়। তাঁকে ঘিরে চোখে পড়ার মতো তেমন অনুষ্ঠানও হয় না। টিভিতেও আলাদা করে তেমন কিছু চোখে পড়ে না। আবার জানুয়ারি মাস, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর মাস ঘিরেও তেমন আলোড়ন দেখা যায় না।

তবে কি বাঙালি সুচিত্রা সেনকে ভুলে গেল? স্মার্টফোনে আচ্ছন্ন বাঙালি কি ইউটিউবে সুচিত্রা সেনের ছবি দেখে? নাকি চটকদার রিলস দেখে আর ফেসবুকের লাইক গুনেই সে দিন অতিবাহিত করে! এই প্রজন্মের কিশোর, তরুণরা কি সত্যিই সুচিত্রা সেন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল! প্রশ্ন যেমন আছে, তেমনই সংশয়ও আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে জাহির করার যে নিরন্তর প্রতিযোগিতা, সেখানে সুচিত্রা সেন সত্যিই বেমানান। খ্যাতির শীর্ষে থাকতে থাকতেই কেউ এভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে পারেন! একমাস–দু'মাস নয়। প্রায় চার দশক এভাবে আড়ালে থাকতে পারেন! প্রতিমুহূর্তে নিজের নানা ভঙ্গিমার ছবি পোস্ট করা লোকেদের পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন।

এসে গেল সেই ১৭ জানুয়ারি। একইসঙ্গে জ্যোতি বসু ও সুচিত্রা সেনের মৃত্যুদিন। চাইলে দু'জনকেই শ্রদ্ধা জানানো যেত। জ্যোতি বসুকে নিয়ে আগেও বেঙ্গল টাইমসে নানা লেখালেখি হয়েছে। তাই এবার মনে হল, বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে যদি মহানায়িকাকে শ্রদ্ধা জানানো যায়, কেমন হয়! নানা আঙ্গিক থেকে আকর্ষণীয় কিছু লেখা নিয়ে এই সংকলন। লেখাগুলি পড়ে বর্তমান প্রজন্ম যদি সুচিত্রা সেনকে আরও ভালভাবে জানতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন, মাঝবয়সী বা বর্ষীয়াণ পাঠকরা যদি একটু স্মৃতিমেদুর হয়ে ওঠেন, সেটাই হবে পরম প্রাপ্তি।

স্বরূপ গোস্বামী
সম্পাদক,
বেঙ্গল টাইমস

বন্ধুত্বের শুরুই হয়েছিল ঝগড়া দিয়ে

তিনি ছিলেন কিংবদন্তি সাংবাদিক। একইসঙ্গে সুচিত্রা সেনের বন্ধু। সুচিত্রা বিদায় নিয়েছেন ২০১৪ তে। তিন বছর পর বন্ধুর কাছে পাড়ি দিয়েছেন তিনিও। তাঁদের বন্ধুত্ব আজও মিথ হয়ে আছে। কীভাবে আলাপ? একসময় সেই স্মৃতিই মেলে ধরেছিলেন বর্ষীয়াণ সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরি। সুচিত্রা সেনের জন্মদিনে উঠে এল সেই স্মৃতিচারণ।

জীবনের পশ্চিম সীমান্তে এসে গেছি। এই বয়সে এসে অনেক স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে। আমারও ঘটনাবহুল জীবনের সবকিছু হুবহু মনে আছে, এমন দাবি করছি না। সময়ের স্রোতে অনেক স্মৃতি হারিয়ে গেছে। কিন্তু কিছু স্মৃতি থাকে, যা চাইলেও ভোলা যায় না। টুকরো টুকরো কত ঘটনা, তার কত অভিঘাত। যখন ঘটেছিল, তখন হয়ত সেভাবে রেখাপাত করেনি। এখন, এই পরিণত বয়সে এসে সেগুলো অন্য অনুভূতি তৈরি করে। আবার উল্টো উদাহরণও আছে। তখন হয়ত কোনও একটি ঘটনাকে বিরাট গুরুতর মনে হয়েছিল, আজ সেগুলো মনেও পড়ে না।

দীর্ঘ জীবনে অনেক গুণী মানুষের সাহচর্য পেয়েছি। খুব কাছ থেকে তাদের দেখারও সুযোগ পেয়েছি। আমার একজন বিশেষ বন্ধু ছিল। আমার সেই বন্ধুকে নিয়ে আমি

সে লোক চক্ষুর আড়ালে। কিন্তু আমার মাঝে মাঝেই সৌভাগ্য হয় তার সঙ্গে কথা বলার। সে মাঝে মাঝেই আমার বাড়িতে হানা দেয়। বলে আজ খেয়ে যাব। মাঝে মাঝে আমারও ডাক পড়ে তার বাড়িতে। নিজের আনন্দের কথা বলে, যন্ত্রণার কথাও বলে। এখানে কোনও অভিনয় নেই। দুই বন্ধুর প্রাণখোলা আড্ডা। সেসব কথা উঠে আসবে এই স্মৃতিচারণে।

আগেও নানা জায়গায় লিখেছি। তাই যাঁরা আগের সেই লেখাগুলো পড়েছেন, তাঁরা ঘটনাগুলো জানেন। তাদের মনে হতে পারে পুনরাবৃত্তি। তবে এমন সুন্দরী নায়িকাকে নিয়ে এক কথা বারবার বলাটা দোষের কিছু নয়। তাছাড়া, নতুন নতুন কথা তো আর আবিষ্কার করতে পারব না। অতিরঞ্জন করতেও পারব না। বানিয়ে বলতেও পারব না। যা ঘটেছিল, তাই বলব। কথায় কথায় ব্যাখ্যা দেওয়া আমার কাজ নয়। এভাবে অনেকে লেখার কলেবর বাড়ান। আমার আবার এই অভ্যেসটাও নেই। তাই যা ঘটেছিল, শুধু তাই তুলে ধরব। অনেককিছু হয়ত ভুলে গেছি। তাই কিছু ঘটনা বাদও পড়ে যাবে।

আমার সেই বন্ধু কে? আর ভনিতা করে লাভ নেই। তাঁর নামটা বলেই ফেলা যাক। সুচিত্রা সেন। হ্যাঁ, এই সুচিত্রা সেন আমার বন্ধু। তাঁকে বন্ধু ভাবতে বেশ গর্বই হয়। আমরা প্রায় সমবয়সী। একে অন্যকে তুমি বলেই সম্বোধন করি। দুজনেই দুজনকে বিশ্বাস করি। দুজনে দুজনের সঙ্গে খুনসুটিও করি। গত তিন দশক

নিশ্চয় অনেকদিনের আলাপ!

একেবারেই না। ওর খুব বেশি ছবি দেখেছি, এমনও নয়। ও যতদিন অভিনয় করে গেছে, আমি শুধুমাত্র সাড়ে চুয়াত্তর ছবিটা দেখেছিলাম। আর কোনও ছবিই দেখিনি। আলাপ হওয়ার পরে অবশ্য কয়েকটি ছবি দেখেছি। কীভাবে আলাপ হল, সেটা বরং বলা যাক। না, কোনও অনুষ্ঠানে আলাপ নয়। আলাপটা হয়েছিল ঝগড়া দিয়ে। সেটাও উত্তম কুমারের মৃত্যুর দিনে।

আমি তখন যুগান্তরে। মাঝরাতে মারা গেলেন উত্তম কুমার। সকাল থেকেই ছুটে বেড়াচ্ছে রিপোর্টাররা। এমন দিনে বাঙালি পাঠক সবার আগে কার প্রতিক্রিয়া জানতে চায়? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, সুচিত্রা সেন। সন্ধে নাগাদ আমিও আমার কাগজের একজন রিপোর্টারকে পাঠালাম সুচিত্রা সেনের

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও সে সুচিত্রার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। সুচিত্রা বাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু দেখা করেননি। আমার সেই রিপোর্টার আর কোনও আশা না দেখে অফিসে ফিরে এল।

তার কাছে শোনার পর তাকেই বকাঝকা করলাম। খবরের কাগজে এমনটা হয়েই থাকে। তাকে বললাম, কাল কাগজ খুলেই মানুষ জানতে চাইবে সুচিত্রা সেন কী বলেছেন। তাদের সেই চাহিদাও তুমি পুরণ করতে পারলে না। এমন একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েও তুমি সুচিত্রার সঙ্গে দেখা করতেই পারলে না। তখন জানতে চাইলাম, আনন্দবাজার ইন্টারভিউ পেয়েছে কিনা। শুনলাম, আনন্দবাজারের সেবাব্রত গুপ্তর সঙ্গে নাকি সুচিত্রা কথা বলেছেন। তখন রাগ আরও বেড়ে গেল। ও পারল, আর তুমি পারলে না!

কী আর করা যাবে? রেগেমেগে নিজেই ফোন করে বসলাম সুচিত্রার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে। অনেকক্ষণ টেলিফোন বাজার পর কে একজন ধরলেন। বললেন, উনি কথা বলতে পারবেন না। তখন আমি তাঁকে শুনিয়ে দিলাম, 'কথা বলবেন না মানে? একটু আগে উনি আনন্দবাজারের সঙ্গে বাড়িতে বসে কথা বলেছেন। তাহলে, আমাদের সঙ্গে এমন ন্যাকামি করছেন কেন?' হ্যাঁ, সেদিন রাগের মাথায় ন্যাকামি শব্দটাই প্রয়োগ করেছিলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, আমি এগুলোই কাগজে লিখব। বলেই ফোনটা রেখে দিলাম।

ঠিক আধঘণ্টা পরে একটা ফোন এল। এক মহিলা কণ্ঠস্বর। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি দুঃখপ্রকাশ করলেন। বললেন, আমার ভুল হয়ে গেছে। স্বয়ং সুচিত্রা সেন ফোন করেছেন! তখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু আমার তো সেই রাতেই প্রতিক্রিয়া দরকার। নিজেই চটপট করে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। উনি একের পর এক উত্তর দিয়ে গেলেন। সেটাই পরেরদিনের কাগজে ছাপা হল।

সেই থেকে বন্ধুত্বের সূচনা। একদিন ওঁর বাড়িতে ডাকলেন। গেলাম। খাওয়া দাওয়া হল। এ কথা–সে কথার পর সম্পর্কটা আরও গাঢ় হতে লাগল। কখনও সকালে যাচ্ছি, কখনও দুপুরে, আবার কখনও সন্ধ্যায়। আপনি থেকে তুমি তে নেমে আসতে খুব একটা দেরি হল না। সুচিত্রা থেকে আমার কাছে সে হয়ে উঠল রমা। হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রি ওকে যে নামেই ডাকুক, আমি ওকে রমা বলেই ডাকি। আমি একদিন মজা করে বললাম, 'রমা আমার'। সে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কী বলছ? আমি বললাম, 'রমা আমার' এই কথাটাকে উল্টে দাও। দেখবে মানেটা একই থাকবে। আসলে, আমি তোমাকে সামনে পেছনে সমানভাবে দেখি, তাই। এভাবেই শুরু হল নতুন বন্ধুত্ব। যে বন্ধুত্বে কখনও চিড় ধরেনি।

ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় সুচিত্রা ছাড়া কাকেই বা মানাত!

কাকে মানাবে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায়? মুম্বইয়ে তখন অভিনেত্রীর অভাব নেই। একের পর এক গ্ল্যামারাস মুখ। তবু গুলজারকে কিনা ছুটে আসতে হয়েছিল কলকাতায়! লিখেছেন স্বরূপ গোস্বামী।।

নিশ্চয় সেই আঁধি ছবির কথা মনে পড়ছে? সুচিত্রার হিন্দি ছবি বললে সবার আগে ওই ছবিটাই যে ভেসে ওঠে। অথচ, সুচিত্রা মাত্র একটি হিন্দি ছবি করেছেন, মোটেই এমন নয়। সাত সাতটি ছবির মধ্যে আঁধি ছবিটাই তাঁর শেষ ছবি। ওই শেষ ছবিটাই অবশ্য সবথেকে বেশি দাগ কেটেছিল দর্শকদের মনে।

আঁধিতে আসার আগে অন্য ছবিগুলোতে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। সুচিত্রার প্রথম হিন্দি ছবি কিন্তু ১৯৫৫ সালে। শরৎচন্দ্রের দেবদাসকে সেলুলয়েডে এনেছিলেন পরিচালক বিমল রায়। দেবদাসের ভূমিকায় দিলীপ কুমার। আর সুচিত্রা হয়েছিলেন চন্দ্রমুখী। ১৯৫৭ তে মুক্তি পেল দুটো হিন্দি ছবি। হৃষীকেশ মুখার্জির মুসাফির এবং নন্দলাল কাওয়াল্তলালের চম্পাকলি। ১৯৬০

সালে দু'খানা ছবি করলেন দেবানন্দের সঙ্গে। ছবির নাম বোম্বাই কা বাবু, শরহদ। মাঝে কিছুদিনের বিরতি। বাংলায় 'উত্তর ফাল্গুনী' তখন সুপারহিট। তার আদলে ১৯৬৬ নাগাদ অসিত সেন হিন্দিতে বানালেন 'মমতা'। মা ও মেয়ে দুই ভূমিকাতেই সুচিত্রা সেন। একজনের প্রেমিক অশোক কুমার, মেয়ের প্রেমিক ধর্মেন্দ্র। তারপর আরও আট বছরের ব্যবধান। ১৯৭৪ নাগাদ মুক্তি পেল আঁধি। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হল নানা বিতর্ক। এমনকি জরুরি অবস্থায় নিষিদ্ধও করা হয়েছিল এই ছবিকে।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর একটি পর্ব থাকে। সেই পর্বটা তেমন মধুর নয়। কারণ, গুলজারের চিত্রনাট্য শুনে প্রথমে ফিরিয়েই দিয়েছিলেন সুচিত্রা। গুলজার তখন নবীন পরিচালক। খেটেখুটে, দরদ দিয়ে চিত্রনাট্য লেখেন। একদিন একটা চিত্রনাট্য নিয়ে গেলেন সুচিত্রার কাছে। সুচিত্রা শোনার পর প্রাথমিকভাবে রাজি হলেন। কিন্তু বললেন, স্ক্রিপ্টের বেশ কিছু জায়গা বদল করতে হবে। গুলজার জানতে চাইলেন, কেন? সুচিত্রা বললেন, এখানে এমন কিছু সংলাপ আছে, যা

আমাকে মানায় না। গুলজার মেনে নিলে হয়ত সমস্যা থাকত না। কিন্তু বয়স কম, তার ওপর কিছুটা ঠোঁটকাটা। গুলজারও বলে ফেললেন, ‘আপনার মুখে মানাবে কিনা, সেই ভেবে তো চিত্রনাট্য লেখা হয়নি। যে চরিত্রটার মুখে এই সংলাপ, তার মুখে কিন্তু এই সংলাপ বেমানান নয়।’ গুলজারের কথাগুলো বোধ হয় ঠিক পছন্দ হয়নি সুচিত্রার। তাই ছবি নিয়ে কথাবার্তা আর এগোলো না।

ওদিকে গুলজার মেতে রইলেন অন্যান্য ছবি নিয়ে। আস্তে আস্তে বেশ নাম ছড়াল। এদিকে সুচিত্রাও কলকাতায় একের পর এক ছবি করে চলেছেন। এদিকে সঞ্জীব কুমারের খুব ইচ্ছে, তিনি সুচিত্রা সেনের সঙ্গে অন্তত একটা হিন্দি ছবি করবেন। প্রযোজক জে ওমপ্রকাশও চাইছেন সঞ্জীব–সুচিত্রা জুটিকে নিয়ে হিন্দি ছবি বানাতে। তাঁরা দুজনেই এলেন গুলজারের কাছে। তাঁদের ইচ্ছে, ছবিটা পরিচালনা করুন গুলজার। একটি গল্প শোনানো হল। কিন্তু গুলজারের ঠিক পছন্দ হল না। তিনি বললেন, ‘এ তো সাধারণ ছবি। এটার জন্য কলকাতা থেকে সুচিত্রা সেনকে আনতে হবে কেন? এটা তো বম্বের যে কোনও অভিনেত্রীই পারবে। সুচিত্রাকে যদি আনতেই হয়, তাহলে আরও ভাল কোনও ছবির জন্য আনতে হবে।’

নতুন করে বিষয় ভাবতে লাগলেন গুলজার। তখনই মাথায় এল আঁধির কথা। বলা হল সঞ্জীব কুমারকে। তিনি তো এককথায় রাজি। মনে হল, এই ছবির জন্য সুচিত্রাকে বলাই যায়। ততদিনে গুলজারও অনেকটা পোড়খাওয়া। বুঝেছেন, সুচিত্রা সেনকে রাজি করাতে হলে দরকার হলে চিত্রনাট্য একটু আধটু বদলানোই যায়। এবার গুলজার এলেন কলকাতায়। আগের সেই সাক্ষাতের কথা বেশ মনে আছে সুচিত্রার। তখন গুলজারও বলিউডের নামকরা পরিচালক। ফলে, সুচিত্রার মনেও কিছুটা সমীহ তৈরি হয়েছে। তাই এবার সুচিত্রা বললেন, গল্পটা যদি ভাল লাগে,

নিশ্চয় করব। না ভাল লাগলে করব না। তবে আপনাকে চেঞ্জ করতে বলব না।

সুচিত্রা রাজি। বম্বে এসেই গুলজারকে বলতে শুরু করলেন স্যার। এত সিনিয়র অভিনেত্রী স্যার বলে ডাকছেন! কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছিল গুলজারের। তিনি একবার সুচিত্রাকে বারণও করলেন। সুচিত্রার জবাব— 'আপনি ডাইরেক্টর। আমি আপনাকে স্যারই বলব।' গুলজার বললেন, বেশ, আমিও তাহলে আপনাকে স্যার বলব। সুচিত্রা বললেন, ঠিক আছে, তাই বলবেন। সেই থেকে দুজনেই একে অপরকে স্যার বলে সম্বোধন করতে শুরু করলেন।

কাজ শুরুও হয়ে গেল। নিছক একটা ছবি নয়। এই ছবি করতে গিয়ে কলকাতার বেশি কিছু ছবি ফিরিয়েও দিলেন। সুচিত্রাও চাইলেন মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করতে। যত ভোরেই শুটিং থাকুক, সুচিত্রা ঠিক সময়ে হাজির। বরং সমস্যা দেখা দিল নায়ক সঞ্জীব কুমারকে নিয়ে। তিনি একটু দেরিতে ঘুমিয়ে ওঠেন। তৈরি হয়ে আসতে অনেকটা সময় লেগে যায়। ভয়ে ভয়ে রইলেন গুলজার। সুচিত্রার মেজাজের কথা ততদিনে তিনিও জেনে গেছেন। ভয় হচ্ছে, যদি সুচিত্রা বলে বসেন, আমি কারও জন্য অপেক্ষা করতে পারব না, আপনি অন্য কাউকে দিয়ে ছবি বানান। আমি চললাম।

না, তেমনটা ঘটেনি। বরং সুচিত্রা সমস্যাটা বুঝতে পেরে নিজেই দায়িত্ব নিলেন সঞ্জীবকে ঘুম থেকে তোলার। ততদিনে তিনি মজা করে সঞ্জীব কুমারের একটি নামকরণ করে ফেলেছেন। অন্য নায়কদের তুলনায় সঞ্জীব একটু মোটা ছিলেন। তাই সুচিত্রা ডাকতে শুরু করলেন 'মোটু'। শুরুর দিকে আড়ালে

আবডালে। পরের দিকে সবার সামনেই ডাকতে লাগলেন ‘মোটু’ বলে। অন্য কেউ এই নামে ডাকলে সঞ্জীব কুমার নিশ্চয় রেগে যেতেন। কিন্তু সুচিত্রা ডাকলে হজম না করে উপায় কী!

সকাল হলেই সঞ্জীবের ঘরে সুচিত্রার ফোন চলে যেত। এই যে মোটু, এবার ওঠো। তাড়া দিয়ে নিয়ে আসতেন লোকেশানে। শুটিংয়ে এসে স্পটবয়দের বলতেন, মোটুকে লিয়ে চায়ে লে আও। বেচারা সঞ্জীব! তখন মুচকি মুচকি হাসতেন। কারণ, ততদিনে তিনিও সুচিত্রার ফ্যান হয়ে পড়েছেন। ছবিতে নানা বয়সের নানা মুহূর্ত ফুটে উঠেছে। কখনও তিনি প্রেমিকা, কখনও জনতার ভিড়ে জনপ্রিয় নেত্রী। কখনও রাগী, কখনও স্নেহশীলা। সব দৃশ্যেই সাবলীল। আর ওই গান! তেরে বিনা জিন্দেগি সে কই, তুম আগেয়ে হো, ইস মোড় সে জাতি হো। গানগুলো ঝড় তুলল মানুষের হৃদয়ে।

সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীর জীবনীকে ভিত্তি করে তৈরি নয়। তবে কোথাও কোথাও ছায়া তো আছেই। ইন্দিরা গান্ধী নিজেও ভেবে নিলেন এই ছবি তাঁকে নিয়ে তৈরি। ফলে, জরুরি অবস্থার সময় গুলজারের তৈরি ছবিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়ার পর জনতা সরকার আবার সেই ছবিকে ছাড়পত্র দিল। শুধু তাই নয়, দূরদর্শনেও দেখানো হল।

এদিকে নিজেকে ততদিনে গুটিয়ে নিয়েছেন সুচিত্রা। ছবির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এমনকি পুরনো মানুষদের সঙ্গেও আর সম্পর্ক নেই। কিন্তু গুলজারের সঙ্গে পুরনো বন্ধুত্ব থেকে গেল। গুলজার কলকাতা এলেই সুচিত্রার ঘরে ঠিক ডাক পড়ত। একবার গুলজার কলকাতায় এসেছেন। কিন্তু সুচিত্রার সঙ্গে দেখা করেননি। রাতে গ্র্যান্ড হোটেলে তাঁর ঘরে একজন টোকা দিলেন। সুচিত্রার ঘনিষ্ঠ একজন বললেন, চলুন, উনি লবিতে বসে আছেন। সে কী, স্বয়ং সুচিত্রা হোটেলের লবিতে! দ্রুত নেমে এলেন গুলজার। দেখলেন, লবির একেবারে কোনের দিকে একা

বসে আছেন এক মহিলা। হ্যাঁ, তিনিই সুচিত্রা সেন। গুলজার বললেন, এ কী! আপনি নিজে? আপনি তো বাইরে বেরোন না। লোকে দেখে ফেলবে তো! সুচিত্রা বললেন, দেখুক, আপনি আমার গাড়িতে উঠুন। জোর করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। খাইয়ে দাইয়ে তারপর ফেরত পাঠালেন।

সুচিত্রার বাড়িতে গুলজারের যাতায়াত আছে, এটা অনেকেই জানতেন। দুইয়ে দুইয়ে চার হতে কতক্ষণ! খবর ছড়িয়ে গেল, আবার ছবিতে ফিরছেন সুচিত্রা। কাগজে রীতিমতো সুপারলিড হল। সুচিত্রা তখন পন্ডিচেরিতে। কিন্তু সেখানেও এই খবর পৌঁছে গেল। না, তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। তারপর কী হয়েছিল? গুলজারের মুখেই শোনা যাক। 'কলকাতায় ফেরার পরই আমি তাঁকে ফোন করলাম। একথা সেকথার পর বললাম, শুনেছেন খবরটা?' উনি হাসলেন। জানতে চাইলাম, সত্যিই ছবি করবেন না আর? উনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনি বললেই করব।'

তাহলে আর বললেন না কেন? গুলজার বললেন, 'আমি জানি, উনি আর ছবি করবেন না। হাসতে হাসতে বললেন ঠিকই, কিন্তু সুচিত্রা সেনের মনের কথা আমি জানতাম। তাই জোরাজুরি করিনি। আমি জোরাজুরি করলে তাঁকে 'না' বলতে হত। সেটা আমি চাইনি। চাইনি একটা সুন্দর বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাক।'

না, জোরাজুরি করেননি গুলজার। জানতেন, সুচিত্রা সেনের বন্ধু হতে গেলে অন্তত কিছু সংযম দরকার। তাই বন্ধুত্ব শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। অনেকের জন্য দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও গুলজারের জন্য ওই বাড়ির দরজা চিরদিন খোলাই ছিল।

গাড়ি থেকে নেমে এলেন সুচিত্রা সেন

একা সুচিত্রা, একা তিনি। একঘরে ঠিক একঘণ্টা পাঁচ মিনিট। সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি রোমন্থন করলেন তুষার প্রধান।

আঁধির ইন্দিরা গান্ধীকে মনে পড়ছিল খুব। আমি যখন সুচিত্রা সেনের সামনে বসে। সপ্তপদীর রিনা ব্রাউনের মুখটাও খুব মনে পড়ছিল। আমি তখন সুচিত্রা সেনের সামনে বসে। একফাঁকে তাঁর মুখে সাগরিকার সেই হাসি। মনে হচ্ছিল, একটু আগেই হারানো সুর-এর তরুণী ডাক্তার রমাকেই দেখলাম বোধহয়। একটু বাদেই গৃহদাহ-র অচলাকেও দেখা হয়ে গেল। আমি সুচিত্রা সেনের হাত ধরে ফেললাম।

আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগের কথা। আমি তখন যে দৈনিকে কাজ করি, রিপোর্টার হিসেবে

প্রায় সমস্ত টপ অ্যাসাইনমেন্ট ছিল আমার জন্য নির্দিষ্ট। সে দার্জিলিং পাহাড়ের গোলমাল হোক, বা কয়লাখনির হাড়হিম করা মানুষ চাপা পড়া দুর্ঘটনা কিম্বা মায়াবতীর ইন্টারভিউ অথবা বাঁকুড়ায় হাতি বা সুন্দরবনে বাঘের পেছনে ছোটা।

এভাবেই একদিন রাতে ডিউটি সেরে অফিস ছাড়ার মুখে আমাকে বলা হল, আজ আর বাড়ি যাওয়ার দরকার নেই। ভোরে সুচিত্রা সেনের বেরোনোর কথা। ওই অ্যাসাইনমেন্টটা তোমার। সঙ্গে দুজন ফটোগ্রাফার ভাস্কর পাল আর শিখর কর্মকার। রাতে আমহার্স্ট স্ট্রিটের অফিসেই থেকে গেলাম (এখন অবশ্য ঠিকানা বদল করে সেই অফিস চলে গেছে সেক্টর ফাইভে)। সকাল থেকেই যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি। গাড়ির চালকের সঙ্গে কথা বলে নিলাম। তিনজনে তৈরি হয়ে যে জায়গায় সুচিত্রা সেনের আসার কথা, তার থেকে অন্তত পাঁচশো মিটার দূরে আড়ালে গাড়ি রেখে দিলাম। যে কাজের জন্য সুচিত্রা সেনের বেরোনোর কথা, তাতে সকাল দশটার আগে সুচিত্রার কোনওমতেই আসার কথা নয়। কিন্তু সুচিত্রা সেন বলে কথা, ওঁর জন্য নিয়ম ভাঙতে রাজি হবেন না, এমন কেউ কি আছেন! কোনও ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। কারণ, এমন সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। তাই তিনজনে তিনদিকে আলাদা পায়চারি। যেন এস পি জি-র লোকজন আর কী! চোখে ঘুম নেই আমাদের কারোরই। ঘুম আসার কথাও নয়। সুচিত্রা সেনের জন্য কত লোক জীবন দিতে রাজি থাকে। আর আমরা সামান্য একটা রাত জাগতে পারব না! দু'চোখে তখন ঘুম নয়, শুধুই রোমাঞ্চ।

অভিনয়ে কিছু ম্যানারিজম থাকলেও সুচিত্রা ইজ সুচিত্রা। যেমন অমিতাভ ইজ অমিতাভ। উচ্চারণ এবং স্বর প্রক্ষেপণে কিছু কৃত্রিমতা থাকলেও সুচিত্রা আমার কাছে আজও সুচিত্রা সেন। মনে পড়ে যাচ্ছিল শিল্পী ছবির শেষ দৃশ্যের কথা, যেখানে 'ধীমান...ধীমান' ডাকের আর্তিতে প্রেক্ষাগৃহে শ্রাবণধারা বয়েছিল। আমরা তখন সেই মুডি নায়িকার অপেক্ষায় যিনি শুটিংয়ের ফ্লোর থেকে খাঁচা খুলে টিয়া পাখিকে উড়য়ে দেন। পরিচালক অজয় করকে কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বলেন, 'বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল বেচারা...। তাই উড়িয়ে দিলাম..। সরি, উড়য়ে দিলাম।' মনে পড়ে যায় তোপচাচির লেকের সেই বোটিংয়ের দৃশ্য, যেখানে ঠোঁটের অভিসারে ফুটে ওঠে, 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়/ এ কী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু' গানটি। মনে পড়ে যায় চাওয়া পাওয়া-র রিপোর্টার রজতের কথা। রিপোর্টার হিসেবে একেবারেই ফ্লপ রজত। স্কুটারে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে একটা খবর নিয়ে সে যখন হাপাতে হাপাতে সম্পাদকের ঘরে ঢোকে, তখন সম্পাদক বলেন, আর কয়েক মিনিট দেরিতে এলে এই খবরটা আর কষ্ট করে দিতে আসতে হত না। তুমি দু পয়সা দিয়ে রাস্তা থেকে কিনতে পারতে। মানে, কাগজে ছাপা অবস্থাতেই পেয়ে যেতে। রাগে, দুঃখে, অভিমানে, ক্ষোভে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে রজত। সে যে ট্রেনে পাটনায় যাচ্ছিল, সেই ট্রেনে এসেই ওঠে বাড়ি পালানো মঞ্জু। টিকিট নেই, টাকা পয়সাও কিছু

নেই মঞ্জুর সঙ্গে। উদ্ধার করে রজত। মঞ্জুকে পাটনায় একটা বিচ্ছিরি হোটেলে নিয়ে গিয়ে তোলে রজত। স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকে ওরা। মঞ্জুকে খুঁজে দিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার। সেই পুরস্কার রজতকে প্ররোচিত করে। এদিকে জেদি মঞ্জু ততদিনে প্রেমে পড়ে গেছে রজতের। শেষপর্যন্ত মঞ্জুর সম্পাদক বাবার কাছে তাকে পৌঁছে দেয় রজত। শেষ দৃশ্যে দেখা গেল, দশ হাজার টাকার চেকটা ফিরিয়ে দিল রজত। মঞ্জুর দেওয়া একটা আঙটিও ফিরিয়ে দিল। এর কিছুক্ষণ আগেই মঞ্জু রজতের বিরুদ্ধে উগরে দিয়েছে লোভি, নিচ, ঠগ, বিশ্বাসঘাতক— এসব নানা বিশেষণ। রজত ফিরে যেতে থাকে। পেছন থেকে মঞ্জু ডাকে, তারপর সুচিত্রা-উত্তম, যা হয়!

মনে পড়ে যায় কোন্নগরের এক রিকশ চালকের বাড়িতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পুনর্জন্ম নিয়েছেন শুনে মাঝরাতে সেই শিশুকে দেখতে ছুটে যান সুচিত্রা। আসলে, ১৯৭৮ সালের পর রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষা নেওয়া সুচিত্রা সেন আর সিনেমার নায়িকা বলে কিছু নন। একথাও তো জানাই ছিল। তবু কেন অপেক্ষা? সুচিত্রা সেনকে দেখা। কারণ, সুচিত্রা সেনকে দেখা যায় না, দেখা পাওয়া যায় না। মুখোমুখি হওয়া তো দূরের কথা।

সুচিত্রা সেনের হাত ধরলাম তো অনেক পরে। তার আগে ওর মুখোমুখি আমি একা, পাক্কা এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট। হ্যাঁ, ইনি সেই সুচিত্রা সেন। যাঁকে দিয়ে ছবি করানোর প্রস্তাব নিয়ে

একরাশ লালগোলাপ-সহ তাঁর বাড়িতে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন রাজ কাপুর। তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে রাজ কাপুর তাঁর সিনেমায় অভিনয় করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সুচিত্রা পরে বলেছিলেন, মেয়েদের পায়ের কাছে যিনি ওভাবে বসে পড়েন, তাঁর ছবিতে কাজ করা যায় নাকি? এই সেই সুচিত্রা সেন, যিনি দেবদাস ছবিতে দিলীপ কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছেন, দিলীপ কুমারকে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় অভিনেতা হিসেবে মেনে এসেছেন। এই সেই সুচিত্রা সেন, যাঁর বাড়তে সঞ্জীব কুমার অনেকবার এসেছেন।

সুচিত্রা সেন তখন আমার সামনে বসে। যে ঘরটায় আমরা দুজনে মুখোমুখি বসে, সেখানে বসে সুচিত্রা সেন আমাকে কতটা জরিপ করেছিলেন, জানি না। তবে আমি ওঁকে যেভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, তা যে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির ফল, মোটেও সেরকম দাবি করব না। সেদিন সুচিত্রাকে দেখে মনে হয়েছিল, মেরিলিন মনড্রো-র মতো জীবন্ত ভেনাস নন ঠিকই, কিন্তু দেবী চৌধুরানীর মতোই ব্যক্তিত্বময়ী। সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল যে ব্যাপারটি, পাহাড়ি মেঘেদের মতো দ্রুত বদলে যায় সুচিত্রার মুখের অভিব্যক্তি। সেদিন সুচিত্রাকে দেখে মনে হয়েছিল, তখনও পর্যন্ত বাংলা সিনেমা জগতে 'স্টাইল ইজ দি উওম্যান' যদি কাউকে বলা যায়, তবে তিনি আজও সেই 'পথে হল দেরী'র সুচিত্রা সেন। কারা সুপ্রিয়া দেবীকে বাংলার সোফিয়া লোরেন বিশেষণ দিয়েছিলেন, জানি না। তবে সুচিত্রাকে সামনা সামনি দেখার পর, কিংবা ওঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাংলা সিনেমার কোনও তুলনীয় নায়িকার নাম মনে পড়েনি। যখন সুচিত্রাকে ক্রমাগত দেখে যাওয়ার পর্ব চলছে, তখন কী একটা কথার ফাঁকে সুচিত্রা যেন হেঁসেছিলেন। ব্রায়ান লারা যেভাবে ক্যাচ লুফতেন, সেভাবেই সুচিত্রার সেই হাঁসি ক্যামেরাবন্দী করেছিলেন ভাস্কর পাল। ভাস্কর দীর্ঘদিন ধরেই মুম্বইবাসী। প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। এখন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে কোথায় গেছে, কে জানে!

গ্রেটা গার্বোর মতো আড়ালপ্রেমী সুচিত্রাকে যতক্ষণ দেখেছি, ততক্ষণই অভিভূত হয়েছি। মনে মনে ভেবেছি, এ দেখা যেন শেষ দেখা না হয়। সেদিন যে ঘরে আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম, সে ঘরে দুজন দুজনকে দেখা ছাড়া আর কিছু দেখার মতো ছিল না। প্রিমিয়ার পদ্মিনী গাড়ি থেকে নেমে ঘরে ঢুকে সানগ্লাসটা টেবিলে খুলে রাখলেন। টেবিলের পেছনের চেয়ারে বসলেন। দিনটি ছিল ১৬ জুলাই, ১৯৯৬। সুচিত্রা বসার পরে আমিও বসলাম। সুচিত্রার দু চোখ ভরে তখন অদ্ভুৎ শাসনের ছবি। গাছের ছায়ার মতো স্থিতধী মুখ। আমার মন খারাপের সমস্ত ভাষা তখন মেঘ হয়ে গেছে। বুকের ভেতরে তখন উদোম বাজনা ঘর। স্বপ্নের নায়িকার চেনা কণ্ঠস্বর বেশ কয়েকবারই ভারী ভারী ঠেকেছে। শুরুতেই আবদার করে বসেছিলাম, ম্যাডাম একটা অটোগ্রাফ দেবেন? নোটবই বাড়িয়ে দিতেই সুচিত্রা মুহূর্তের মধ্যে 'প্রিয় বান্ধবী'-র পথচারিণীর মতো অহঙ্কারের

বর্ম পরে নিয়েছিলেন। গ্রীবা ঘুরিয়ে নেন সরাসরি দেওয়ালের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ যেন গাঢ় অন্ধকারের নিস্তব্ধতা। সরহদ– এর চঞ্চলা নায়িকার মুখমণ্ডল জুড়ে সময় পর্যন্ত দোলহীন। এই অহঙ্কারের গরিমাতেই তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের দেবী চৌধুরানীর কন্ট্রাক্ট। ইনি সেই সুচিত্রা সেন, আমার সেই স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা। যিনি মুখে মুখে উচ্চারিত হয়েছেন, পেন পেন পেন/পাইলট পেন/সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা সুচিত্রা সেন।

মৌনতার সাদা অন্ধকারে ঘেরা হলঘরে বসে তখন তাঁর আত্ম মগ্নতার পুকুরে ঢিল ছুঁড়ি, সেই সাধ্য কোথায়! সে বড় কঠোর সময়। বাউল বাতাস তখন ঝড় তুলেছে মনের মধ্যে। মনে পড়ে যাচ্ছিল, হ্যাঁ, ইনিই তো একসময় বলেছিলেন, ‘আমি অভিনেত্রী, তাতেই আমার গর্ব। আমার সব অহঙ্কার। সেখানে আমি সাধারণের থেকে আলাদা।’ স্মৃতির ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল, ৫২/৪/১, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ভগ্নস্তুপের মধ্যে পড়ে থাকা আন্তর্জাতিক পুরস্কারের সেই সার্টিফিকেটটির কথা। নার্গিসের পর দ্বিতীয় ভারত শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হয়েছিলেন সুচিত্রা সেন, সাত পাকে বাঁধা ছবির জন্য। ৬৩ তে এই অর্জন ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর সেই সার্টিফিকেটও যখন খন্ডহরের ভগ্নস্তুপে গড়ায়, তখনই বোঝা উচিত ছিল, সুচিত্রা আর পুরনো দিনের স্মৃতিকে আগলে রাখতে চান না। সুচিত্রার মুখের অভিব্যক্তিতে ততক্ষণে বুঝে গেছি, উনি বলতে চাইছেন— একসময় বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সিনেমা করেছি বটে, কিন্তু আজ আর সেইসব ছবি পিছু টানে না। সেই দিনগুলোকে পেছন ফিরে দেখার এতটুকুও তাগিদ অনুভব করি না।’

অথচ সেদিন এই পুরস্কার পাওয়ার খবরে এই সুচিত্রাই বলেছিলেন, ‘কাগজের পাতার খবরটা আমায় শুধু চমকে দেয়নি, বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে। তাই পুরস্কার লাভের আনন্দে তখনই বিহ্বল হয়েছি, যখন আমায় ঘিরে আমার

চারপাশের সঙ্গীরা মুখর হয়ে উঠেছে। সেই আনন্দই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জয়।'

হয়ত আজ সেই 'জয়' তাঁর কাছে একান্তই মূল্যহীন। আবার তাই যদি ঠিক হবে, তবে আজও কেন হেমন্ত কণ্ঠে শোনেন 'বসে আছি পথ চেয়ে/ফাগুনের গান গেয়ে' । কিংবা এই পথ যদি না শেষ হয়/ তবে কেমন হতো তুমি বল তো।' রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুরনো সেই গান তখনও তাঁর দীনযাপনের প্রধান সঙ্গী। কানন দেবী তো ভারতের প্রথম মহিলা সুপারস্টার, বাসবদত্তা- বেশে শুধু শাড়ি পরা ছবি আছে তাঁর। কিন্তু সুচিত্রার সে ধরনের কোনও ছবি নেই। তবুও উত্তম সুচিত্রার মতো রোমান্টিক জুটি বাঙালি আজও পায়নি। সাগরিকা ছবির সেই বিজ্ঞাপনটার কথা ভাবুন— 'প্রণয় মধুর ভূমিকায় আমাদের যুগল অভিনয়ের পথে সাগরিকা স্মরণীয় হয়ে রইল।' তার নিচেই উত্তম সুচিত্রার স্বাক্ষর।

বাঙালি কি ভুলতে পারে উত্তমের সেই ইন্টারভিউ, যেখানে উত্তম বলছেন, — 'রমা আমাকে উতো বলে ডাকে, ভালবাসে। এটাই বাস্তব। এটাই সত্য। দেখা গেল, একদিন সেই রমা (সুচিত্রা) আমার বউ হয়ে গেল। হঠাৎ আমি মরে গেলাম। অনেক নারী খুঁজবে রমার হৃদয়-জুড়ে থাকা উতোকে (উত্তম) জয় করে নিতে। এতে আলটিমেট কী দাঁড়াবে?' এরপর উত্তমের সহাস্য মন্তব্য ছিল, ব্যাপারটা মোটেও জমবে না।

জমেনি তো আজও। তাঁর কপালে আজও টিপ ওঠেনি। সেদিন তাঁর পরনে ছিল ময়ূর নীল রঙা ভয়েলের কাপড়ে চিকনের দুরন্ত কাজ করা সালোয়ার কামিজ। পায়ে চোখ টানা সাদা চটি (একসময় এই সুচিত্রাই গাড়িতে পনেরো থেকে কুড়ি জোড়া জুতো রাখতেন)।

এদিন সুচিত্রার মুখের অভিব্যক্তি ছিল 'ফুল বনে পাথর'। এরকম যখন ভাবছি, তখন সুচিত্রা একবার তাকালেন। অবিকল পাথরপ্রতিমা। সস্নেহ দৃষ্টি। বললেন, কী জানতে চাও তুমি? আমি শুনলাম, কী বলতে চাও তুমি? সকাল সেই এগারোটা পাঁচ মিনিট থেকে বারোটা তিরিশ পর্যন্ত ঠায় বসে। এরই মধ্যে ছুটে এলেন দুই যমজ যুবক— শুভঙ্কর এবং তীর্থঙ্কর দাস। সুচিত্রার প্রতিবেশী ওঁরা। সুচিত্রা সেদিন বসেছিলেন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের নিচতলার স্টাফরুমে। এসেছিলেন ভোটার পরিচয় পত্র করানোর জন্য ছবি তুলতে। বাইরে তখন সচিত্র পরিচয়পত্র করাতে আসা লোকজনের ভিড়। চিৎকার, চেঁচামেচি। মুখ ঢাকতে দরজার আড়ালে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন সুচিত্রা। ইতিমধ্যেই টিভলি কোর্টের এক মহিলা রীনা চ্যাটার্জি (খান্না) টের পেয়ে গেছেন, ইনিই সুচিত্রা সেন। আমার কাছে সাহস পেয়ে ভেতরে

ঢুকলেন রীনা। আমার খুব মনে আছে, সাহসে ভর করে অটোগ্রাফও চাইলেন। বিরক্ত সুচিত্রা বলে উঠলেন, এরকম করলে আমি কিন্তু এখনই এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাব। পরিস্থিতি যাতে না বিগড়ায়, সেজন্য বুদ্ধিমতীর মতো ঘর থেকে বেরিয়েই গেলেন রীনা।

এবারে দোতলায় উঠতে হবে, ভোটার পরিচয়পত্রের ছবির জন্য। সুচিত্রা সেন উঠে দাঁড়ালেন। চোখে সানগ্লাস চড়ালেন। জানতে চাইলাম, ভোট দেন? ঘাড় নাড়লেন। ‘চতুরঙ্গ’— তে অভিনয়ের ইচ্ছে ছিল আপনার। এখন আর সে ইচ্ছে হয় না? রা কাড়লেন না সুচিত্রা।

আপনার এই স্বেচ্ছা নির্বাসিত জীবন কীভাবে কাটানোর ইচ্ছে? কোনও জবাব দিলেন না বটে। তবে একটু নরম সফেন হাসি খেলল তাঁর মুখে। এক হাতে মুখের একাংশ ঢেকে চলতে শুরু করলেন। আমি ওঁকে হাত ধরে এবং কোমরে একটু সাপোর্ট দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সাহায্য করলাম। সুচিত্রা কিন্তু তখনও আমাকে সাংবাদিক ভাবেননি। তাই স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকা নিয়ে প্রশ্ন করায় হয়ত মজাই পেয়েছেন। বোঝাতে চেয়েছেন, রুশ লোকগাঁথার সেই প্রবাদ বাক্যটা— ‘তোমার একান্ত স্বপ্নের সংখ্যা এক। সুতরাং কখনই তা তুমি দ্বিতীয় কাউকে বলবে না।’

ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেই আলোয় আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলেন সপ্তপদীর রিনা ব্রাউন। আমি তো না হয় এতক্ষণ বকবক করেছি। কিন্তু চিত্র সাংবাদিকদের যে তখনও ছবি তোলা হয়নি। তারা আর কতক্ষণই বা অপেক্ষা করবে! তাছাড়া, সামনে সুচিত্রা

থাকলে কার আর সংযম থাকে! তাদের জীবনেও তো এমন মুহূর্ত এই প্রথম। রোমাঞ্চ আসাই তো স্বাভাবিক। দুই চিত্র সাংবাদিকের ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠতে লাগল ঘনঘন। বিরক্ত সুচিত্রা আদেশ করলেন, স্টপ ইট। স্টপ ইট। বুঝেছিলাম, সুচিত্রা কমান্ড হারাননি।

বুঝে গেছেন, তিন সাংবাদিকের ঘেরাটোপে পড়ে গেছেন তিনি। সিঁড়ি পথ ভেঙে গেটের মুখে ফটোগ্রাফারদের ছবি তোলায় বাধা দিতে ওড়না খুলে মুখের সামনে দোলাতে লাগলেন স্কুল বালিকার মতো। ওড়নায় মুখ ঢাকতে ঢাকতে সেই কালো প্রিমিয়ার পদ্মিনীতে গিয়ে উঠলেন, যেটার চালকের আসনে ততক্ষণে বসে গেছেন শুভঙ্কর। গাড়ি কিছুদূর গিয়ে থামল হালদার সুইটসে। গাড়ি থেকে নামলেন সুচিত্রা। সেই দোকান থেকে এক বাক্স মিষ্টি কিনে তুলে দিলেন শুভঙ্করের হাতে। শুভঙ্করের আপত্তি নাকচ করে দিয়ে বললেন, ‘তোর মা দিচ্ছে রে, নে।’

দেওদার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের কাছে গিয়ে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে যেই দেখলেন দুই চিত্র সাংবাদিক তক্কে তক্কে রয়েছেন, অমনি সুন্দর পা দুটি গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন। আমাদের এড়াতে সুচিত্রা আর গাড়ি থেকে নামলেনই না। সোজা চলে গেলেন মুনমুনের বাড়ি। গাড়ির কাঁচের জানালায় কিন্তু তখন লিপগ্লস মাখা ঠোঁটে সুচিত্রা সেনের ভুবনমোহিনী হাসি। সাংবাদিক এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ‘জয়’এর হাসি।

তিনি না হয় এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু আমরা! আমাদের জয় যে আরও বড়। গর্ব করে বলতে পারব, আমরা সুচিত্রা সেনকে দেখেছি। বলতে পারব, আমি সুচিত্রা সেনের হাত ধরেছি। সাংবাদিকতা এমন এক পেশা, যা অনেক সেলিব্রিটির কাছে আসার সুযোগ করে দিয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর ইন্টারভিউ নিতে গিয়েও এমন রোমাঞ্চিত হইনি। কিন্তু সুচিত্রার ইন্টারভিউ বলে কথা। এই শিহরন এত বছর পরেও আছে। সারাজীবন থাকবে।

তার ছিঁড়ে গেছে কবে!

উত্তম বিদায় নিয়েছেন ১৯৮০ তে। উত্তম-সুচিত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮০, এই ১৮ বছরে জুটির ছবির সংখ্যা মাত্র ৬। অনেক আগেই যেন সেই তার ছিঁড়ে গেছে। লিখলেন বিপ্লব মিশ্র।।

বাংলা ছবির রোমান্টিক জুটি বলতে কাদের বোঝায়? এই প্রশ্নটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। সবাই একটাই উত্তর দেবেন, উত্তম-সুচিত্রা। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো, এমন জুটির কথা কোনও ছবির পোস্টারে বা টাইটেল কার্ডে দেখেছেন কিনা। শুরুর দিকের কয়েকটা ছবিতে হয়ত উত্তম-সুচিত্রা পাবেন। কিন্তু অধিকাংশ ছবিতেই উত্তম-সুচিত্রা পাবেন না। এখন তো ইন্টারনেটের যুগ। একটু সার্চ করলেই অনেক ছবির পোস্টার পেয়ে যাবেন। বা টিভিতেও মাঝে মাঝেই পুরানো ছবিগুলো দেখায়। ইউটিউবেও অনেক ছবি পেয়ে যাবেন। একবার শুরুর দিকটা চালিয়ে দেখুন। টাইটেল কার্ডে সবার আগে সুচিত্রার নাম। আগে সুচিত্রা, পরে উত্তম।

এমনটা কেন হয়েছিল? পরিচালকরা কি তুকতাক বিশ্বাস করতেন? নাকি লেডিজ ফার্স্ট এর তত্ত্ব মেনে চলতেন? আসলে, এটা ছিল সুচিত্রার একটা শর্ত। পরিচালকদের কাছে তিনি শর্ত দিতেন, পোস্টারে আমার নাম উত্তম কুমারের আগে রাখতে হবে। উত্তম কুমার ক্রমশ মহানায়ক হয়ে উঠছেন। পরিচালক-

প্রযোজকরা চাইছেন, তাঁদের ছবিতে উত্তম কুমার কাজ করুন। তাঁকে ভেবেই চিত্রনাট্য লেখাও হচ্ছে। অথচ, সেই মহানায়ককে কিনা সুচিত্রার এইসব শর্ত মেনে নিতে হচ্ছে। অন্য কোনও নায়িকা যদি এমন শর্ত আরোপ করতেন, উত্তম কুমার নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে ছবি করতেন না। অন্য নায়িকা এমন শর্ত দেওয়ার সাহসও পেতেন না।

কিন্তু সুচিত্রা বরাবরই অন্যরকম। আর দশজনের সঙ্গে তাঁর অনেক ফারাক। তাই তিনি অবলীলায় শর্ত দিতেন, আমার নাম আগে দিতে হবে। আর উত্তম কুমারকেও সেই শর্ত হজম করতে হত। পরের দিকে আমরা ছবির টাইটেল কার্ডে একটা জিনিস দেখতে পাই। শুরুতে সুচিত্রার নাম। তারপর একের পর এক পার্শ্ব অভিনেতার নাম। সবার শেষে লেখা 'এবং উত্তম কুমার'। এই 'এবং উত্তম কুমার'কে দেখে অনেকে ভাবতে পারেন, এটা উত্তম কুমারের নতুন কোনও স্টাইল। আসলে, তিনিও একটা সম্মানজনক রাস্তা খুঁজছিলেন। শুরুতে যখন সুচিত্রার নাম রাখতেই হবে, তারপরে কেন তিনি থাকবেন? তার চেয়ে বরং একেবারে শেষে 'এবং উত্তম কুমার' হওয়াই ভাল। তিনিও একটি পাল্টা কৌশল নিয়েছিলেন। সুচিত্রার পরে থাকুক পাহাড়ি সান্যাল, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, ছায়া দেবী, মলিনা দেবী- এসব নাম। সবার শেষে বিশেষ আকর্ষণ নিয়ে হাজির 'এবং উত্তম কুমার'। একটা চমকও হল, আবার সুচিত্রার অহঙ্কারকে একটু 'শিক্ষা দেওয়া'ও হল।

কে বড়, সে তর্ক তোলা থাক। তবে উত্তম কুমারও বুঝতেন, তাঁর জনপ্রিয়তার অনেকটাই নির্ভর করছে সুচিত্রার উপর। অন্য নায়িকাদের সঙ্গে যতই ছবি করুন, বাঙালি সবসময় উত্তম-সুচিত্রাকেই দেখতে চেয়েছে। এই জুটিকে দেখার জন্যই সব কাজ ফেলে সে কাউন্টারের সামনে লাইন দিয়েছে। কিন্তু ছয়ের দশকের গোড়াতেই সুচিত্রার মাথায় ঢুকে গেল, উত্তমকে ছাড়াই তাঁর

স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করতে হবে। তিনি যে একা একটা ছবিকে টানতে পারেন, তা দেখিয়ে দিতে হবে। বাষট্টিতে সৌমিত্রকে নিয়ে করলেন সাত পাকে বাঁধা। সেই ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেল। সুচিত্রার অহমিকা আরও কিছুটা বাড়ল। তাঁর উত্তমকে দরকার নেই, এমন একটা বার্তা হাবেভাবে দিতে শুরু করলেন।

সেই জন্যই কি পরের দিকে উত্তমের সঙ্গে ছবির সংখ্যা কমে গেল? সুচিত্রা যে তাঁর নাম আগে লেখার শর্ত দিয়েছিলেন, তা তিনি নিজেই নানা জায়গায় স্বীকার করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই বলেছেন, উত্তমের সঙ্গে আমার এত ছবি, কিন্তু আমি প্রোডিউসারকে বলেছিলাম, আমার নাম বিজ্ঞাপনে আগে দিতে হবে। তারপর সব ছবিতে 'সুচিত্রা-উত্তম', 'উত্তম-সুচিত্রা' নয়।

ওঁদের জুটির প্রথম ছবি সাড়ে চুয়াত্তর। মুক্তি পায় ১৯৫৩ সালে। সেই ছবি অবশ্য পুরোপুরি উত্তম-সুচিত্রার ছিল না। সেটা অনেক বেশি ছিল তুলসী চক্রবর্তী-মলিনা দেবীর ছবি। উত্তম-সুচিত্রার প্রথম হিট ছবি পরের বছর, অগ্নিপরীক্ষা। ৬ বছর চুটিয়ে দুজন অভিনয় করে গেলেন। একষট্টি সাল থেকে লক্ষ করে দেখুন। সুচিত্রাও ছবি কমিয়ে দিলেন। একষট্টিতে মুক্তি পেল একটাই ছবি- সপ্তপদী। বাষট্টিতেও একটাই ছবি- বিপাশা। দুটোতেই নায়ক উত্তম। এরপর পাঁচ বছরের ব্যবধান। ৬৭ তে উত্তমের সঙ্গে গৃহদাহ, ৬৯ এ কমললতা। তার দু বছর পর নবরাগ। উত্তমের সঙ্গে শেয় ছবি পচাত্তরে, প্রিয় বান্ধবী।

না, তারপর থেকে উত্তমের সঙ্গে আর কোনও ছবিই করা হয়নি সুচিত্রার। শেষ দু বছরে দুটি ছবি, দুটোই সৌমিত্রর সঙ্গে। ছিয়াত্তরে দত্তা, আঠাত্তরে প্রণয়পাশা। অনেকে ভাবেন, উত্তম কুমারের মৃত্যুর পরই বোধ হয় উত্তম-সুচিত্রা জুটির বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু সুচিত্রার ছবির তালিকাই বলে দিচ্ছে, শেষ ১৬ বছরে উত্তমের সঙ্গে ছবির সংখ্যা মাত্র ৬। শেষ পাঁচ বছরে একটিও ছবি নেই। উত্তম কুমার মারা গেছেন ১৯৮০ তে। তার দু বছর আগেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন সুচিত্রা। সিনেমা জগৎ থেকে অনেক দূরে, লোকচক্ষুর আড়ালে। আরও একটা বিষয় লক্ষ করা দরকার। দুজনেই বম্বেতে নিজের নিজের মতো করে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। উত্তমও হাফডজনের উপর ছবি করেছেন। সুচিত্রাও প্রায় তাই। কিন্তু দুজন কখনও একসঙ্গে ছবি করার কথা ভাবেননি।

অবশ্য, এসব পরিসংখ্যান নিয়ে বাঙালি কখনই তেমন মাথা ঘামায়নি। সুক্ষ সুক্ষ অনুভূতিগুলো আম বাঙালির অ্যান্টেনায় কখনই সেভাবে ধরা দেয়নি। তারা উত্তম-সুচিত্রা জুটি বলতেই অজ্ঞান।। উত্তম-সুচিত্রা বলতে তাঁদের কাছে ‘হারানো সুর’, সপ্তপদী বা সাগরিকা। সবই পাঁচের দশকের শেষ, অথবা ছয়ের দশকের গোড়ার ছবি। কিন্তু তারপর! শেষ আঠারোটা বছর! সম্পর্কের সেই তারটা বোধ হয় অনেক আগেই ছিঁড়ে গিয়েছিল।

ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়কেও

ধীমান সাহা

একদিকে সত্যজিৎ রায়। অন্যদিকে সুচিত্রা সেন। কিন্তু এই দু'জনের কখনও একসঙ্গে কাজ করা হয়ে ওঠেনি। অথচ, সত্যজিতেরও ইচ্ছে হয়েছিল, সুচিত্রাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে ছবি করবেন। আবার সুচিত্রারও ইচ্ছে হয়েছিল, অন্তত একবার সত্যজিতের ছবিতে কাজ করবেন। কিন্তু ছোট্ট একটা বিষয়কে ঘিরে তৈরি হয় তিক্ততা। যার ফলে, সেই ছবি আর হয়ে ওঠেনি।

পরিচালক সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে সুচিত্রার একটা শ্রদ্ধা ছিল। সুচিত্রা যখন ছবিতে নামলেন, তার দু'বছর পর মুক্তি পেল পথের পাঁচালী। একদিকে সুচিত্রা একের পর এক হিট ছবি করে চলেছেন। অন্যদিকে, সত্যজিৎ রায়ের অন্য ধারার ছবিগুলো দেশে বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছে। সুচিত্রার একমাত্র আন্তর্জাতিক পুরস্কার অজয় করের 'সাত পাকে

বাঁধা’ ছবিতে। সত্যজিৎ রায় ছবিটা দেখেছিলেন। তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। তাঁর পরামর্শেই ছবিটি মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠিয়েছিলেন পরিচালক অজয় কর। সেই ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন সুচিত্রা। সত্যজিৎ যদি পাঠাতে না বলতেন, অজয় কর হয়ত ছবিটা মস্কোতে পাঠাতেনই না। সুচিত্রারও ওই পুরস্কার পাওয়া হত না। এসব কারণে সত্যজিতের প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞতাও ছিল সুচিত্রার।

বড় নায়ক বা নায়িকাদের নেওয়ার ব্যাপারে সত্যজিৎবাবুরও কিছুটা দ্বিধা ছিল। তাই তিনি উত্তম কুমারকে ডেকেছিলেন অনেক পরে, নায়ক ছবিতে। সত্যজিৎ বহুবার বলেছেন, ওই ছবিটা উত্তম কুমার ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওর কথা ভেবেই চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল। সত্যজিতের ইচ্ছে ছিল, সুচিত্রাকে নিয়েও একটি ছবি করবেন। সেই ছবির নাম দেবী চৌধুরানী। ওই ছবির জন্য সুচিত্রা ছাড়া অন্য কারও নাম ভাবেননি সত্যজিৎ। অন্যদিকে, সুচিত্রারও একটা সুপ্ত ইচ্ছে ছিল, সত্যজিৎবাবুর কোনও একটা ছবিতে কাজ করবেন।

একদিন সাতসকালে প্রযোজক আর ডি বনশলকে নিয়ে সুচিত্রার বাড়িতে এলেন সত্যজিৎ রায়। দেবী চৌধুরানীতে প্রফুল্ল চরিত্রটি করার প্রস্তাব দিলেন। সুচিত্রা রাজি। কিন্তু এই সময় সত্যজিৎ রায় একটি শর্ত আরোপ করে বসলেন। তিনি বললেন, আপনাকে কিন্তু আমার ছবিতে এক্সক্লুসিভ আর্টিস্ট হতে হবে। সুচিত্রা জানতে চাইলেন, তার মানে? সত্যজিৎ রায় বললেন, এই ছবির শুটিং চলাকালীন আপনি অন্য কোনও ছবিতে কাজ করবেন না।

শর্তটা মানতে পারেননি সুচিত্রা। বললেন, তা কী করে হয়? এর মধ্যে বেশ কিছু ছবির কাজ চলছে। এগুলো শেষ হলে আরও কয়েকটা ছবির ব্যাপারে আমি কথা দিয়ে রেখেছি। তাছাড়া, যারা আমাকে রমা থেকে সুচিত্রা সেন বানাল, তাদের ছবিতে কাজ করব না? সত্যজিৎ রায় বললেন, হ্যাঁ, করবেন। কিন্তু আমি চাইছি, আপনার পুরো মনোযোগ এই ছবির দিকে থাকুক। তাই এই ছবির শুটিং চলাকালীন অন্য ছবি না করাই ভাল।

সুচিত্রাকে এমন শর্ত কেউ কখনও দেননি। কিন্তু তিনি সত্যজিৎ রায়। তাঁর মনে হতেই পারে, সুচিত্রাকে যখন নেওয়াই হয়েছে, তখন তাঁর কাছ থেকে সেরা কাজটা বের করে আনা জরুরি। আর দশটা ছবির সঙ্গে তিনি যেন এই ছবিকে গুলিয়ে ফেলেন। তিনিও যেন মনপ্রাণ ঢেলে শুধু এই ছবিতেই কাজ করেন। সুচিত্রা বললেন, আপনার ছবি আমি যত্ন নিয়েই করব। আপনাকে আগে ডেট দেব। বাকি সময়ে অন্যদের কাজ করব। আমার চেষ্টায় ত্রুটি থাকবে না।

সেদিন সত্যজিৎ রায় ও বনশল চলে গেলেন। পরেরদিন সকালে কনট্রাক্ট ফর্ম হাতে বনশল হাজির। ফর্মে লেখা ছিল, এক্সক্লুসিভ আর্টিস্ট। দেখার পরই মাথা গরম হয়ে গেল সুচিত্রার। ফর্মটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার বনশল। আমি আপনার ছবিতে কাজ করব না। আপনি আসতে পারেন।

কেউ ভাবতে পারেন, অহঙ্কারী। কেউ ভাবতে পারেন দাম্ভিক। কিন্তু তিনি এমনই। যা মন চেয়েছে, তাই করেছেন। যা মন সায় দেয়নি, করেননি। সত্যজিৎ রায়ের মতো বিশ্ববরেণ্য পরিচালককে ফিরিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি।

ওয়ান অ্যান্ড ওনলি সুচিত্রা সেন

কবিতা

সরল বিশ্বাস

কোথায় গেল সেই লোকটা, কে জানে!
ওই লোকটাই মিষ্টি সকাল বয়ে আনে
হাঁটতে আসে অনেক লোক, সেই লোকটাও আসে
খালি পায়ে একা একাই হাঁটত সবুজ ঘাসে।।

বয়সে সে অনেক বড়, চোখেমুখে দুষ্টুমি
আপনি বললে রেগে যেত, বলতে হত তুমি।
নানান রকম রসিকতা, মাতিয়ে রাখত বুড়ো
বলত, আমি শুধু ছড়িয়া যাব, যত পারিস, কুড়ো।।

নাম কী, কেউ জানে না, সবাই বলত ‘কাকা’
এতটুকু থামা নেই, পায়ে লাগানো চাকা
বয়স কত কে একজন জানতে চাইল সেদিন
কাকা বলল, কী আসে যায়, আমি তো এভারগ্রিন।।

বিয়ে থা করলই না, সারাজীবন একা
তাই বলে থেমে থাকেনি সুন্দরী মেয়ে দেখা
মনে মনে নিশ্চয় কাউকে ভালবাসেন!
কাকা বলত, ওয়ান অ্যান্ড ওনলি সুচিত্রা সেন।।

বিয়ে করা এমন কী আর, চাইলেই করা যেত
বেচারি সুচিত্রা, হয়ত কষ্ট পেত।
প্রেমের কি আর বয়স আছে! আছে কি ভুল ঠিক!
বয়স বাড়লে বয়েই গেল, আমি রোমান্টিক।।

কখনও বলত বিধান রায়, কখনও ছবি বিশ্বাস
সুনীল–শক্তির কথা উঠলেই চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস।
সেদিন যেন সুর কাটল, বিষণ্ণ খুব কাকা
একে একে সব চলে যাচ্ছে, চারপাশটা ফাকা।।

তারপর কয়েকদিন, কাকার দেখা নেই
কাকার কিছু হয়নি তো! হারিয়ে যাচ্ছে খেই।
না আছে মোবাইল, ঠিকানাও নেই জানা
কোথায় খুঁজব তাকে, কোথায় দেব হানা।।

এই তো সেদিন সকালবেলা, যাচ্ছিলাম বাসে
হঠাৎ দেখি কাকা, কে যেন তার পাশে
বাসে নয়, কাকা তখন দূরের একটা পার্কে
আমার মাথায় ঘুরছে প্রশ্ন, কাকার সঙ্গে আর কে?

ভাবলাম, কাছে না গিয়ে দূর থেকেই দেখি
কাকার হাতে তার হাত! সে কী!
কে সেই নারী, হাতে হাত রেখে শুধু হাসেন?
নাটোরের বনলতা নয়, আমাদের সুচিত্রা সেন।।

নন্দ ঘোষের কড়চা

উত্তম ছাড়া সুচিত্রা অচল। অথচ, কত বায়নাক্কা! উত্তমের চেয়ে বেশি টাকা চাই। পোস্টারে আগে নাম চাই। অন্যদের সঙ্গে ছবি হিট হল না কেন? নন্দ ঘোষের আক্রমণের শিকার এবার সুচিত্রা সেন।

একটা উত্তম কুমার ছিলেন, তাই উতরে গেছেন

মুনমুন সেন যৌবনে সুন্দরী ছিলেন সে বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই। বাঙলা সিনেমা জগতে তাঁর মতো সুন্দরী খুব কমই এসেছেন। কিন্তু অভিনয়ের কথা উঠলেই সবাই একবাক্যে বলে, সুচিত্রা সেনের মেয়ে এত বাজে অভিনয় করে কী করে? কেউ আবার বলে, সুচিত্রা সেনের মেয়ে এত ন্যাকা হয় কী করে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে আছে। ভালো অভিনয় করতে না পারা এবং ন্যাকামি দুটো গুণই মুনমুন তাঁর মার থেকে পেয়েছেন। হ্যাঁ, নন্দ ঘোষ অপ্রিয় কথা বলতে ভয় পায় না। সুচিত্রা সেন অতি সাধারণ মানের অভিনেত্রী এবং তিনি বাঙালি নায়িকাদের ন্যাকামির গুরুমাতা।

প্রথমেই আসুন ন্যাকামির কথায়। প্রেম তো অনেকেই করেছেন। প্রেমিকার সঙ্গে বাইকে চেপে ঘুরতেও গেছেন, ঘুরতে ঘুরতে হয়তো গান গেয়েছেন। কিন্তু উত্তমের বাইকের পিছনে বসে সুচিত্রা আলজিভ বের করে যেমন হাসছিলেন, অমন হাসি কারো প্রেমিকা হাসেনি। হাসেনি কারণ ন্যাকার হদ্দ না হলে অমন হাসি হাসা যায় না। দৃশ্যটা উতরে গেছে হেমন্তর গান আর উত্তমের অসাধারণ লিপের জন্য। নইলে সাউন্ড বন্ধ করে দেখুন, কেমন অসহ্য লাগে।

সপ্তপদী সিনেমাতেই, উত্তম ফুটবল খেলছেন, আর সুচিত্রা মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে বিছিত্র মুখভঙ্গি করছেন। জীবনে অনেক খেলা দেখেছি অমন দর্শক কোনওদিন দেখিনি। ধন্যি মেয়েতে জয়া ভাদুড়িও তো খেলা দেখছিলেন। কই অমন ঠোঁট বাঁকানো চোখ নাচানো তো করেননি। এবার আসুন অভিনয়ের প্রসঙ্গে। সুচিত্রা অভিনয় না জানলে তাঁর ছবি হিট করল কেমন করে? উত্তর সহজ, সেই যুগে দারুণ সব গল্প, দারুণ সব পরিচালক, গীতিকার, গায়ক এবং অবশ্যই উত্তমকুমার। এঁরাই ছবিগুলো হিট করিয়েছে। উত্তমকুমার ছাড়া সুচিত্রা কটা সিনেমা করেছেন হাতে গুনে বলা যাবে। সাতপাকে বাঁধা, দত্তা, প্রণয় পাশা, দীপ জ্বেলে যাই, ফরিয়াদ, উত্তর ফাল্গুনী, দেবী চৌধুরানী। উত্তর ফাল্গুনীতে আবার ডবল রোল। এর মধ্যে বুড়ি সুচিত্রা আর সাত পাকে বাঁধা ছাড়া একটাতেও ভালো অভিনয় করতে পারেননি।

আচ্ছা, বাংলার সেরা তিন পরিচালক বললেই এককথায় কাদের কথা উঠে আসে? সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন। এই তিনজন যখন ছবি করছেন, ঠিক তখনই চুটিয়ে অভিনয় করছেন সুচিত্রা। কই, এই তিনজন তো কোনও ছবিতেই সুচিত্রাকে নেননি। সত্যজিৎ রায় নাকি একবার নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু এমন সব বায়না ধরেছিলেন, সত্যজিৎ আর ও মুখো হননি।

সাফ কথা, উত্তম না থাকলে সুচিত্রা অচল। অথচ হরেক বায়নাক্কা। উত্তমের থেকে বেশি টাকা চাই। পোস্টারে নাম আগে থাকবে। তাঁর লিপে দুটো তিনটে গান থাকতে হবে। লিড রোল ছাড়া করব না। কিন্তু অভিনয়? সত্যিকারের মহানায়িকা হলে, অন্যদের সঙ্গে ছবি হিট হত। যেমন হত উত্তমের। সুচিত্রার অভিনয় জীবনের তিনটে সম্বল। সন্ধ্যার গান, উত্তমের অভিনয় আর ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ টেরিয়ে তাকানো। যে তাকানো উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছেন তাঁর মেয়ে মুনমুন সেন।

(নন্দ ঘোষের কড়চা। বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় একটি ফিচার। নন্দ ঘোষের কাজই হল সবকিছুকেই একটু বাঁকা চোখে দেখা। তাঁর শিকারের তালিকা থেকে কারও নিস্তার নেই। এমনকী সুচিত্রা সেনেরও নিস্তার নেই। এই কলামকে নিছক মজা হিসেবেই দেখুন।)

প্রথম ছবির মুক্তি বাইশ বছর পর!

বদলে গেল ছবির নাম। বাইশ বছরে সুচিত্রাও যে অনেক বদলে গিয়েছিলেন। লিখেছেন অভিরূপ অধিকারী।

সুচিত্রা সেনের প্রথম ছবি কী? প্রশ্নটা যত সহজ, উত্তরটা তত সহজ নয়। পাল্টা প্রশ্ন হতেই পারে, সুচিত্রা অভিনীত প্রথম ছবি নাকি মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি?

হিসেব অনুযায়ী, সুচিত্রার মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি সাত নম্বর কয়েদি। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সুচিত্রার প্রথম ছবির মুক্তি বাহাত্তর বছরে পড়ল।

তবে তারও আগে একটা অধ্যায় আছে। সেটা বেশ অবাক করার মতো। সুচিত্রা প্রথম কাজ শুরু করেন 'শেষ কোথায়' ছবিতে। পরিচালক ছিলেন বীরেশ্বর বসু। নায়ক ছিলেন সমর রায়। কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালে। ততদিনে শ্বশুরবাড়ি থেকে অভিনয়ের ছাড়পত্র পেয়ে গেছেন রমা সেন। স্বামী দিবানাথ সেন নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন রমাকে। পরিচালককে অনুরোধ করলেন, তাঁর স্ত্রীর জন্য একটা ভাল কাজের ব্যবস্থা করতে। আশ্বাস দিলেন পরিচালক। সুচিত্রার তখন এমন রূপ, এমন বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি, ফিরিয়ে দেওয়ার উপায়ও ছিল না। কাজ শুরুও হল। কিন্তু মাঝপথেই সেই কাজ থেমে গেল। ফলে ছবি মুক্তি পাওয়ার প্রশ্নই নেই।

প্রথম ছবি শেষ না হওয়ায় কিছুটা হতাশই ছিলেন রমা। কিন্তু তাই বলে তো আর ঘরে বসে থাকা যায় না। এসে গেল আরেকটা সুযোগ। পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত তাঁর প্রথম ছবি 'সাত নম্বর কয়েদি'র জন্য নতুন নায়িকা খুঁজছেন। কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল। রমাকে নিয়ে হাজির স্বামী দিবানাথ। প্রথম দেখাতেই ভাল লেগে গেল পরিচালকের। তবে রমার কথায় তখনও পূর্ববঙ্গের টান। এটা কী করে কাটানো যায়?

পরিচালক বললেন, তোমার বাঙাল টান তো এই ছবিতে চলবে না। তোমাকে কিছুদিন রিহার্সাল করাতে হবে। রাজি হয়ে গেলেন রমা। তারপর কী হল, পরিচালকের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যাক — 'এই রিহার্সালের জন্য রমাকে সাত নম্বর কয়েদির ডায়ালগ দিইনি। দিয়েছিলাম শরৎবাবুর বিন্দুর ছেলে নাটকখানা। কারণ, আমার বিশ্বাস, শরৎচন্দ্রের চেয়ে ভাল সংলাপ লিখিয়ে আজও বাংলা সাহিত্যে কেউ নেই। আশ্চর্য নিষ্ঠা দেখলাম রমার। কয়েকদিনের মধ্যেই সে পশ্চিমবাংলার কথা বলার ধরন অনেকটা আয়ত্ত করে নিল। উচ্চারণ হল অনেক পরিচ্ছন্ন। এ মেয়ে যে পারবে এবং ভালভাবেই পারবে, তাতে কোনও সংশয় রইল না। বিনা দ্বিধায় নায়িকার ভূমিকাটি তাকে দিয়ে দিলাম।'

কিন্তু এবার খটকা লাগল নাম নিয়ে। রমা নামটা খারাপ নয়। কিন্তু পর্দায় দু'অক্ষরের নামটা হালকা হয়ে যাবে না তো? একটা দ্বিধা থেকেই যাচ্ছে। পরিচালক ঠিক করলেন, নাম বদল করা দরকার। নিজেও ভাবলেন। ভাবতে বললেন সহকারী নীতীশ রায়কেও। নীতীশবাবুর পরামর্শেই রমার নাম হয়ে গেল সুচিত্রা। সেই থেকে তিনি সুচিত্রা সেন। উল্টোদিকে নায়ক? না, উত্তম কুমার নয়। সুচিত্রার জীবনে প্রথম নায়ক সমর রায়।

ছবিটা তেমন চলল না। সুচিত্রার ভূমিকাও তেমনভাবে দাগ কাটল না। একটি জনপ্রিয়

বাঙালির কাছে রূপকথার মতোই। সেই সময় কেউ কেউ উদ্যোগ নিলেন, সেই প্রথম ছবিটি যদি সম্পূর্ণ করা যায়! মাঝে পেরিয়ে গেছে বাইশ বছর। সেদিনের সেই কিশোরী রমা হয়ে উঠেছেন স্বপ্নসুন্দরী সুচিত্রা। ছিপছিপে সেই চেহারাও আর নেই। চারপাশের সবকিছুই তো বদলে গেছে। বদলে গেছে দর্শকদের রুচিও। এই অবস্থায় সেই ছবিকে ফিরিয়ে আনা কি ঠিক হবে? দ্বিধা ছিল সুচিত্রার মধ্যেও। ঠিক হল, ছবির চিত্রনাট্যে কিছু বদল আনতে হবে। সবার আগে ছবির নামটাই বদলে ফেলা হল। শেষ কোথায়— এর পরিবর্তে নতুন নাম হল শ্রাবণসন্ধ্যা। ছবিটি মুক্তি পেল ১৯৭৪ নাগাদ। ঠিক বাইশ বছর পরে।

সংবাদপত্রের রিভিউয়ে সুচিত্রা সম্পর্কে লেখা হল, টেনেটুনে পাস। তবে পাশাপাশি চলছিল আরেকটা ছবির কাজ। সেই ছবিতে সুচিত্রার বিপরীতে উত্তম কুমার। ছবির নাম? সাড়ে চুয়াত্তর। ছবিটি মুক্তি পেল ১৯৫৩-র ২০ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ, সাত নম্বর কয়েদি মুক্তি পাওয়ার ঠিক তেরো দিন পর। তার পর কী হয়েছিল, সে এক ইতিহাস।

কিন্তু সেই প্রথম ছবি 'শেষ কোথায়'— এর কী হল? সেটিও মুক্তি পেল। তবে বাইশ বছর পর। তখন সুচিত্রার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। উত্তম-সুচিত্রা জুটি ততদিনে

সেই ছবিটি সাতদিনও চলল না। একদিক দিয়ে ভালই হল। বাইশ বছর আগের আগের রমা আর বাইশ বছর পরের সুচিত্রার মধ্যে যে অনেক ফারাক। একই ছবিতে এই দুই সুচিত্রাকে দেখতে দর্শকের হয়ত ভালও লাগত না। সুচিত্রা নিজেও বুঝতে পারেননি ছবিটার এমন করুণ পরিণতি হবে। জানলে, কখনই দ্বিতীয়বার ওই ছবি করতে রাজি হতেন না।

বন্ধুকে বাঁচাতে গানও গেয়েছিলেন!

গায়িকা সুচিত্রাও জানতেন চ্যালেঞ্জ নিতে। লিখেছেন স্বনাম গুপ্ত।

যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন। না, এখানে সুচিত্রা সেনের রান্না নয়। বিষয় সুচিত্রা সেনের গান। তিনি আবার গান গাইতেন নাকি? এই প্রজন্ম শুনলে হয়ত পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবে। শুধু এই প্রজন্ম কেন, যাঁরা উত্তম-সুচিত্রা বলতে পাগল, তাঁরাও হয়ত বিস্মিত হবেন।

কিন্তু এটা ঘটনা, সুচিত্রা সেন গান গেয়েছিলেন। ছবিতে গেয়েছিলেন। এমনকি মেগাফোন কোম্পানির হয়ে গান রেকর্ডও করেছিলেন।

হঠাৎ গান গাইতে গেলেন কেন? নতুন কোনও চমক তৈরি করার জন্য? একেবারেই না। সময়টা ১৯৫৯। নায়িকা হিসেবে তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। অগ্নিপরীক্ষা, শাপমোচন, সবার উপরে, সাগরিকা, শিল্পী, হারানো সুর— এসব ছবিকে ঘিরে বাঙালি তখন উত্তাল। একের পর এক ছবির অফার আসছে। সময়ের অভাবে ফিরিয়েও দিতে হচ্ছে। এমন সময় গান রেকর্ডিং? গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা?

গানের অভ্যেসটা অবশ্য পুরনো। গানের গলাটা মন্দ ছিল না। রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতেন চমৎকার। কিন্তু রেকর্ডিংয়ে আসার নেপথ্য কাহিনীটা একটু অন্যরকম। মেগাফোন কোম্পানির কর্ণধার কমল ঘোষের অনুরোধেই তাঁকে রেকর্ড করতে হয়। আরও ভালভাবে বলতে গেলে, বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতেই তাঁকে গান গাইতে হয়েছিল।

গানের দুনিয়ায় মেগাফোন কোম্পানির বেশ সুনাম ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম, অনেকেই রেকর্ড করেছেন মেগাফোন কোম্পানির হয়ে। কিন্তু একসময় সেই সুনাম ফিকে হয়ে এল। বাজারে তখন আরও অনেকে এসে গেছেন। সেই সুনাম আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। মেগাফোনকে নতুন করে চাঙ্গা করতে গেলে কী করতে হবে? কমলবাবু দ্বারস্থ হলেন সুচিত্রা সেনের। আবদার করলেন মেগাফোনকে চাঙ্গা করতে তাঁকে রেকর্ড করতে হবে। সুচিত্রা জানতেন, অনেক বিরূপ সমালোচনা হতে পারে। গান ভাল না লাগলে ছবিতেও তার প্রভাব পড়তে পারে। তবু ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কমলবাবুর অনুরোধ ফিরিয়ে দিতে পারেননি।

তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়, ঠিক করলেন আধুনিক গান রেকর্ড করবেন। একপিঠে রইল 'আমার নতুন গানের নিমন্ত্রণে আসবে কি/আমায় তুমি আগের মতো তেমন ভালবাসবে কি?' আরেক পিঠে 'বনে নয়, আজ মনে হয়/যেন রঙের আগুন প্রাণে লেগেছে।' দুটি গানই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা। সুর দিয়েছিলেন বারীন চট্টোপাধ্যায়। দুটি গানই বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

শুধু বন্ধুত্বের তাগিদে রেকর্ডিং রুমে চলে গিয়েছিলেন, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। কমলবাবুর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, 'নায়িকা থেকে গায়িকা হওয়ার জন্য কী অসাধ্যসাধন করেছেন। গান রেকর্ড করার আগে দিনের পর দিন আমাদের গড়িয়াহাটের বাড়িতে সুরকার রবীনদার সঙ্গে বসে গানের রিহার্সাল দিয়েছেন। গাইয়ে না হয়েও জেদ ধরে গান শিখে যে রেকর্ড করা যায়, তা আমি প্রথম দেখলাম সুচিত্রা সেনকে।' এখানেই শেষ নয়, এরপর গৃহদাহ ছবিতেও একটা গান তিনি নিজে গেয়েছিলেন।

নায়িকা সুচিত্রা বাঙালির হৃদয়ে চিরদিন থেকে যাবেন। কিন্তু গায়িকা না হয়েও একটা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে যেভাবে গান করতে এগিয়ে এসেছিলেন, সেই ইতিহাসটাও জানা দরকার। নইলে মহানায়িকাকে জানার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যাবে।

ছিঁড়ে ফেললেন সৌমিত্রর জামা

প্রশান্ত বসু

সুচিত্রা সেন একবারই আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেটা কোন ছবির জন্য? কুইজে ভাল একটা প্রশ্ন হতে পারে। আন্দাজে একেকজন একেক রকম উত্তর দেবেন। নিশ্চিতভাবে উত্তম কুমারের সঙ্গে করা ছবিগুলোর কথাই উঠে আসবে। কিন্তু না, যে ছবির জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন, তার নায়ক উত্তম কুমার নন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ছবির নাম সাত পাকে বাঁধা।

সুচিত্রার প্রথম ছবি 'সাত নম্বর কয়েদি' মুক্তি পায় ১৯৫৩ সালে। তার এক মাসের মধ্যেই বেরোলো সাড়ে চুয়াত্তর। সেটাই সুচিত্রার প্রথম হিট ছবি। সেই প্রথম উত্তম-সুচিত্রা একসঙ্গে। তবে এই ছবিতে উত্তম-সুচিত্রাকে অবশ্য ঠিক নায়ক-নায়িকা বলা যাবে না। তখন ওটাকে উত্তম-সুচিত্রা জুটির ছবি বলাও হত না। বরং তখন অনেকে বলতেন তুলসী চক্রবর্তী-মলিনা দেবীর ছবি। উত্তম-সুচিত্রাকে তখন অনেক কাগজেই পার্শ্বচরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছিল। সেই যাত্রা শুরু। তারপর একে একে কত ছবি! বাংলা চলচ্চিত্র পেয়ে গেল নতুন এক জুটিকে।

ওই জুটির বিখ্যাত কয়েকটা ছবির দিকে

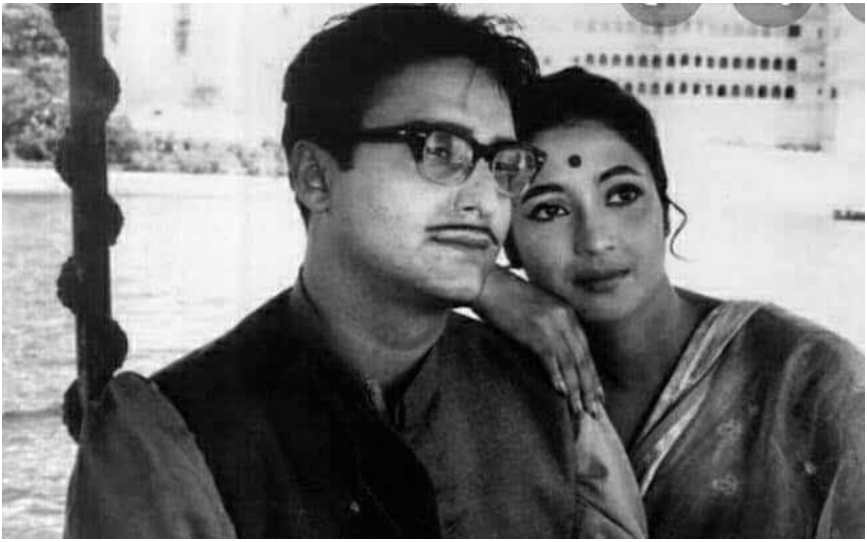

একবার চোখ বোলানো যাক। চুয়ান্নতে বেরোলো ওরা থাকে ওধারে, মরণের পরে, সদানন্দের মেলা, অন্নপূর্ণার মন্দির, অগ্নিপরীক্ষা, গৃহপ্রবেশ। এর মধ্যে অগ্নিপরীক্ষা তো সুপার হিট। পরের বছর, অর্থাৎ পঞ্চান্ন সালে বেরোলো সাঁঝের প্রদীপ, শাপমোচন, সবার উপরে। ছাপ্পান্নতে সাগরিকা, একটি রাত, ত্রিযামা, শিল্পী। সাতান্নতে হারানো সুর, চন্দ্রনাথ, পথে হল দেরী, জীবনতৃষ্ণা। আঠান্নতে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, ইন্দ্রাণী, সূর্যতোরণ। তারপরের বছর চাওয়া পাওয়া। একষট্টিতে সপ্তপদী। অর্থাৎ, ওই জুটির বেশির ভাগ হিট ছবি ওই সময়েই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তাৎপর্যের ব্যাপার হল, তারপর থেকে বছরে সাত-আটটি ছবি নয়, ছবির সংখ্যাও কমিয়ে দিলেন সুচিত্রা। এমনকি উত্তমের সঙ্গেও ছবি করা অনেক কমে গেল। ষাট সালে উত্তমের সঙ্গে একটিও ছবি নেই। একষট্টিতে একটিমাত্র ছবি—সপ্তপদী। বাষট্টিতেও একটি মাত্র ছবি— বিপাশা।

তবে কি উত্তমের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন সুচিত্রা? সেই কারণেই উঠে এল সাত পাকে বাঁধা ছবির কথা। তার আগেই উত্তমকে ছাড়া অনেক ছবি করেছেন। কিন্তু উত্তমের সঙ্গে জুটি বাঁধার পর থেকে উত্তমের সঙ্গেই তাঁর নামটা উচ্চারিত হত বেশি। হয়ত সেই কারণেই একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তৈরি করতে চাইছিল সুচিত্রা। তখনই অজয় করের পরিচালনায় সাত পাকে বাঁধা-র কাজ শুরু হল। সুচিত্রা নিজেই চেয়েছিল, এই ছবিতে উত্তম নয়, তার বিপরীতে থাকুন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

সৌমিত্রর সঙ্গে জুটি বেঁধে সেটাই তাঁর প্রথম ছবি।

এই ছবির যখন শুটিং চলছে, তখন বাড়িতেও অশান্তি চরমে। স্বামী দিবানাথ সেনের সঙ্গে তখন রোজ নানা কারণে ঝামেলা হত। একদিন তো শুটিংয়ে আসার আগে রাগের মাথায় স্বামীর জামা ছিঁড়ে দিয়ে শুটিং করতে এলেন। একদিকে বাড়িতে যখন দাম্পত্য কলহ, তখন সাত পাকে বাঁধার চিত্রনাট্যেও দাম্পত্য কলহ। অধ্যাপক সৌমিত্রর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না গৃহবধু সুচিত্রার। ঘরে আর পর্দায় যেন একই দৃশ্য।

প্রত্যেকদিন শুটিংয়ে গিয়ে পরিচালক অজয় করকে বলতেন, ‘আচ্ছা, ওই দৃশ্যটা এমনি করে করলে কেমন হয়?’ অজয় কর শুনতেন। অনেক ক্ষেত্রে সেই পরামর্শ মেনেও নিতেন। যেদিন বাড়িতে স্বামী দিবানাথ সেনের জামা ছিঁড়ে এসেছিলেন, সেদিনই ছবিতেও একটা রাগের মুহূর্তের শুটিং ছিল। শুটিংয়ের আগে বায়না ধরে বসলেন, পরিচালককে বললেন, আমি যদি রাগের মাথায় নায়কের জামা ছিঁড়ে দিই, তাহলে অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য হবে। পরিচালক মেনে নিলেন। যাঁরা সাত পাকে বাঁধা ছবিটা দেখেছেন, তাঁরা ওই জামা ছেঁড়ার দৃশ্যটা নিশ্চয় দেখেছেন। এভাবেই ঘরের সমস্যাকে সেলুলয়েডেও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

ছবিটা দেখার পর সত্যজিৎ রায় খুব খুশি হয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শেই ছবিটা মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানো হয়। সেরা অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছিল সুচিত্রা সেন। তাঁর জীবনে ওই একটি ছবির জন্যই আন্তর্জাতিক পুরস্কার। আর সেই ছবিটি উত্তমের সঙ্গে নয়, সৌমিত্রর সঙ্গে।

স্বপন যদি মধুর এমন!

স্বরূপ গোস্বামী

হঠাৎ বেজে উঠল মোবাইলটা। অচেনা নম্বর। সাতসকালে কে আবার ফোন করে জ্বালাত করছে! অচেনা নম্বর দেখলে ফোন ধরার ব্যাপারে একটা দ্বিধা থেকেই যায়। ফোন না ধরার একটা 'সুনাম' ইতিমধ্যেই আমি অর্জন করেছি। যথারীতি এই ফোনটাও বেজে গেল, বেজেই গেল। থাক, সাত সকালে কে ফোন করে মাথা খাবে। যদি খুব দরকার হয়, সে আবার করবে। এই ভাবতে না ভাবতেই আবার বেজে উঠল। না, এবার ধরা যাক।

ধরলাম। ওপার থেকে এক মহিলা কণ্ঠস্বর। কিছুটা যেন চেনা। তবে একটা বয়সের ছাপ। কে হতে পারে? আমার নাম জানতে চাইলেন। বললাম। তারপর বললেন, আপনি আমার ইন্টারভিউ নিতে চেয়েছিলেন?

সাত সকালে এ তো আচ্ছা ঝামেলা! কার সঙ্গে কথা বলছি, সেটাই জানি না। কী করে বলব, তার ইন্টারভিউ নিতে চাই কিনা।

কিন্তু এভাবে তো বলা যায় না। তাই আমতা আমতা করে বললাম, না, ম্যাডাম, আপনি কে, জানলে সুবিধা হত।

ওপার থেকে আওয়াজ এল – আমি সুচিত্রা সেন।

সু—চি—ত্রা—সে- ন ! আমি তখন কী বলব, খুঁজে পাচ্ছি না। ভাষা হারিয়ে ফেলছি।

না, মানে হ্যাঁ, মানে আপনি, আপনি ভাল আছেন?
আপনি চিঠি লিখেছিলেন। ইন্টারভিউ নেওয়ার কথা লিখেছিলেন। আপনার চিঠি আমার ভাল লেগেছে। তাছাড়া, এভাবে কেউ কখনও অ্যাপ্রোচ করেনি। আপনি আসতে পারেন। তবে পনেরো মিনিট। তার বেশি নয়।

আমিঃ হ্যাঁ, কিন্তু কবে, মানে কখন যাব?
সুচিত্রাঃ আজ। ঠিক বারোটা পনেরোয়। বাড়ি চেনেন?

আমিঃ না, মানে হ্যাঁ।
সুচিত্রাঃ যে কোনও একটা কথা বলুন। হয় বলুন না, নইলে বলুন হ্যাঁ।

আমিঃ কিছু মনে করবেন না। এই প্রথমবার আপনার সঙ্গে কথা বলছি তো! আমি কিছুটা নার্ভাস। আগে আপনার বাড়ি দেখেছি। যদি চিনতে নাও পারি, ঠিক খুঁজে নেব।
সুচিত্রাঃ তাহলে, রাখছি। ঠিক বারোটা পনেরো।

বলেই ফোন রেখে দিলেন। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। ঠিক শুনছি তো! যে সুচিত্রার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য দেশের সেরা চ্যানেলগুলি মুখিয়ে আছে, সেই সুচিত্রা সেন কিনা নিজে থেকে ফোন করে ইন্টারভিউ দেবেন! কেউ ইয়ার্কি মারছে না তো?

না, তাও তো হওয়ার কথা নয়। আমি যে সুচিত্রা সেনের ঠিকানায় চিঠি লিখেছিলাম, এটা তো ঘটনা। কাউকে তো চিঠির কথা বলিওনি। হতেই পারে, সেই চিঠি উনি পড়েছেন। এই নেটের যুগে কেউ তো চিঠি লেখে না। তাই হয়ত আমার চিঠিটা তাঁর খুব আন্তরিক মনে হয়েছে। পড়ার পর মনে হয়েছে, ছেলেটা এত করে যখন লিখেছে, তখন ইন্টারভিউ দেওয়াই যায়।

মাত্র পনেরো মিনিট! আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই তো দশ মিনিট লেগে যাবে। কী প্রশ্ন করব? যদি রেগে যান! তাঁর যা মুডের কথা শুনেছি, হুট করে হয়ত বলে বসবেন, অনেক হয়েছে, এবার এসো। ছবি তুলতে দেবেন তো? যদি ক্যামেরা দেখলেই রেগে যান! এখনকার চেহারাটা দেখাতে চাইবেন না, সেটাই স্বাভাবিক। আবার ছবি না থাকলে তো কেউ বিশ্বাসও করবে না। ভাববে গুল মারছি।

ঝটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এগারোটার আগেই বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে পৌঁছে গেলাম। সোয়া বারোটা মানে সোয়া বারোটা। এক মিনিটও দেরি করা যাবে না।

বাড়ির গেটের সামনে চারজন দারোয়ান। গুটি গুটি পায়ে গেলাম। বললাম, ম্যাডামের সঙ্গে একটু দেখা করব।
আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপলেন। বললেন,

কে আপনি? ম্যাডাম কারও সঙ্গে দেখা করেন না, এটা জানেন না ?

বললাম, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। উনি নিজেই ডেকেছেন।
উনি ডেকেছেন? গুল মারার জায়গা পাননি?

জিজ্ঞেস করে দেখুন। উনি সত্যিই আমাকে ফোন করেছিলেন। সোয়া বারোটায় আসতে বলেছিলেন।
এসব কথাবার্তা চলছে। তখন একজন ভেতরে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনি বারোটা দশ নাগাদ উপরে যাবেন।
আমার হাত পা কাঁপতে লাগল। কী বলব, কী প্রশ্ন করব, সব গুলিয়ে যাচ্ছিল।
বারোটা দশ। একজন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ওপরের সেই ঘরের কাছে। তিনিই ডোরবেল বাজালেন। দরজা খুললেন স্বয়ং সুচিত্রা সেন।

মুখের দিকে ভাল করে তাকানোর আগেই ঝপ করে প্রণাম করে বসলাম। সামনে সুচিত্রা। বহু তাবড় তাবড় লোকেরা তাঁর দেখা পায়নি। আমি কিনা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে! তখন আর পেশাগত কাঠিণ্য কে রাখতে চায়!
বললেন, থাক থাক, ভেতরে এসো।
একটা সোফায় বসতে দিলেন। তারপর ভেতরে ঢুকে গেলেন। নিজেই একটা প্লেটে করে বেশ কিছু মিষ্টি সাজিয়ে নিয়ে এলেন।
আমি ইতস্তত করছি। থাক, এসবের কী দরকার ছিল ?

সুচিত্রাঃ নিশ্চয় খেয়ে আসোনি।
আমিঃ না, মানে হ্যাঁ।
সুচিত্রাঃ আবার সেই না মানে হ্যাঁ! তুমি কি কোনও কথাই পরিষ্কার করে বলতে পারো না?
আমিঃ সামনে সুচিত্রা সেন থাকলে সবার সব কথা গুলিয়ে যায় ম্যাডাম। শুনেছি নাকি উত্তম

কুমারও মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলতেন।
সুচিত্রাঃ তাই বুঝি!

এদিকে আমার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে তিন মিনিট কেটে গেছে। এখন এসব খেজুরে গপ্প থাক।
সুচিত্রা বললেন, আগে খেয়ে নাও।
আমিঃ আপনি খাবেন না?
সুচিত্রাঃ আমি এসব খাই না। কিন্তু আমার বাড়িতে এলে কেউ না খেয়ে যায় না।

হাতে একটা মিষ্টি তুলে নিলাম। বুঝলাম, এবার কথা শুরু করতে হবে।

আমিঃ আপনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন কেন? বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করে না?
সুচিত্রাঃ আর ধৈর্য রাখতে পারলে না? একেবারেই শুরুতেই এই প্রশ্ন!

আমিঃ না, এটাই তো লোকে সবার আগে জানতে চায়।
সুচিত্রাঃ লোকের এত কৌতূহল কেন?
আমিঃ সুচিত্রা সেনকে ঘিরে কৌতূহল হবে না তো কাকে ঘিরে হবে? আপনি যদি মেগা সিরিয়ালে ঠাকুমার রোল করতেন, এখানে ওখানে ফিতে কাটতে যেতেন, সুশীল সমাজের সঙ্গে মোমবাতি মিছিলে হাঁটতেন, বা সরকারের বঙ্গবিভূষণ নিতে যেতেন, তাহলে এত কৌতূহল থাকত না।
সুচিত্রাঃ তাই! তাহলে দূরে থেকে ঠিকই করেছি।
আমিঃ এভাবে গুটিয়ে থাকতে কষ্ট হয় না? চেনা মানুষগুলোকে দেখতে ইচ্ছে করে না?
সুচিত্রাঃ দেখি তো। টিভি খুললেই তো সবাইকে দেখা যায়। কে কী করছে, কে কী বলছে, সবই দেখতে পাই। এত দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গেছি। তাই আর টিভি দেখতেও ইচ্ছে করে না।
আমিঃ তার মানে আপনি সিরিয়াল দেখেন না?
সুচিত্রাঃ তোমরা দেখ নাকি? কী খোরাক পাও সেখান থেকে? যত্তসব রাবিশ। গয়না পরে, বেনারসি পরে রান্না করছে। ঘরে ঘরে ঝগড়া লাগিয়ে দিচ্ছে। টেনে হিঁচড়ে মাসের পর মাস চালিয়ে যাচ্ছে। কারা দেখে, কেন দেখে, বুঝি না।

আমিঃ কিন্তু আপনার সময়ের অনেক অভিনেতা–অভিনেত্রী তো এইভাবেই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন।
সুচিত্রাঃ সিরিয়াল না করলে বুঝি অস্তিত্ব থাকে না? উত্তম কুমারকে কি লোকে ভুলে গেছে?
আমিঃ সবাই তো আর উত্তম কুমার নয়!
সুচিত্রাঃ শুধু উত্তম কুমার কেন, কার নাম বলব? ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যাল, কমল মিত্র, ছায়া দেবী, ভানু ব্যানার্জি, রবি ঘোষ, এদের লোকে ভুলে গেছে? যারা এখনও বেঁচে আছে, তাদের মধ্যেও এমন অনেক নাম করা যায়। আসল কথা হল, কে কেমন কাজ করছে। ঠিকঠাক কাজ করলে এত সহজে লোকে ভুলে যাবে না।

আমিঃ কিন্তু আপনার সঙ্গে যাঁর নাম উচ্চারিত হত, সেই সুপ্রিয়া দেবী তো ডাটা গুড়ো মশলার বিজ্ঞাপন থেকে বেনুদির রান্নাঘর, সিরিয়াল থেকে যাত্রা, রিয়েলিটি শো থেকে রাজনৈতিক মিটিং। সব করেছেন।
সুচিত্রাঃ বেনুকে এভাবে ছোট করা ঠিক নয়।

ও অনেক বড় অভিনেত্রী। ওর ছবিগুলো দেখেছো? মেঘে ঢাকা তারা বা কোমল গান্ধার দেখেছো? দেখলে এই কথা বলতে না। একেকজন একেকভাবে বাঁচে। সবাইকে আমার মতো হতে হবে, এমন কোনও দিব্যি দেওয়া আছে নাকি? ও ওর মতো। তবে সবকিছুতে জড়িয়ে না পড়লেই ভাল করত। নিজের ওজন নিজেকে বুঝতে হয়। ওর এমন কিছু টাকার অভাব পড়েনি যার জন্য ওকে এসব করতে হবে। যদি কথা হয়, ওকে একবার বকে দেব। বলব, নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে।
আমিঃ আপনি এখন থাকলে আপনাকে হয়ত জিৎ বা দেবের ঠাকুমা হতে হত।

সুচিত্রাঃ কে বলল? হ্যাঁ, ওরা হয়ত আমার নাতির পার্ট করত। তার মানে কিন্তু আমি ওদের ঠাকুমা নই।

আমিঃ ব্যাপারটা তো একই রকম।
সুচিত্রাঃ দুটো ব্যাপারকে তোমার একইরকম মনে হল? এই বুদ্ধি নিয়ে তোমরা লেখালেখি করো?

অন্য কেউ হলে পাল্টা দু-চার কথা শুনিয়ে দিতাম। কিন্তু সুচিত্রা সেন বলে কথা। তাঁর সঙ্গে কি তর্ক করা উচিত? নিজেকে বললাম, যা বলছেন, হজম করে যাও। রাগ হলেও দাঁত কেলিয়ে হেসে যাও।

আমিঃ এখনকার ছবি দেখেন?
সুচিত্রাঃ একেবারে দেখি না বললে ভুল হবে। তবে দেখতে ইচ্ছে করে না। মুনমুনের অনেক ছবিই দেখেছি। রাইমার ছবিও দেখেছি। এখন তো ছবি দেখার জন্য হলে যাওয়ার দরকার পড়ে না। ঘরে বসেই দিব্যি দেখা যায়।
আমিঃ এখন তো অনেক নতুন নতুন পরিচালক

আসছেন। বেশ ভাল কাজ করছেন। বাংলা ছবিতে নতুন নতুন ভাবনা আসছে।
সুচিত্রাঃ ও সব ব্যাপার নিয়ে কিছু না বলাই ভাল। যার নাম করব, সে স্ক্রিপ্ট নিয়ে হাজির হয়ে যাবে। যার নাম করব না, তার রাগ হয়ে যাবে। তবে ঋতুপর্ণ যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে, ভাবিনি। শুনেছি, ও নাকি অনেকবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। কী জানি, আমাকেও হয়ত তুই-তোকারি করে বসত (বলেই মুচকি হাসলেন)।

আমিঃ সত্যিই কি আর ছবিতে নামতে ইচ্ছে করে না ?
সুচিত্রাঃ ইচ্ছে হলে কি পরিচালক জুটত না? সুচিত্রা সেনের বাজার নিশ্চয় এতটা পড়ে যায়নি। আমার বয়স কত, জানো তো? লোকে ভাবে, আমার বয়স বোধ হয় সেখানেই থেমে আছে। বোঝাতে পারি না, এই পঁয়ত্রিশ বছরে আমার বয়সটাও আরও পঁয়ত্রিশ বছর বেড়েছে।
আমিঃ চৌত্রিশ বছর পর তো রাজ্যে পরিবর্তন ঘটল। আপনার ভাবনাতে পরিবর্তন আসতে পারে না ?
সুচিত্রাঃ রাজনীতির সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেললে ! আমি নিজেকে এতদূরে রাখার পরেও যদি জড়িয়ে ফেলো, তাহলে তো মহা মুশকিল। আমি তো এসব কিছুতে নেই। তাছাড়া, এখন এই বয়সে লোক হাসিয়ে কোনও লাভ আছে ?
আমিঃ শোনা যায়, গুলজার নাকি একবার আপনাকে নিয়ে ছবি করতে চেয়েছিলেন। স্বেচ্ছা নির্বাসন ভেঙে আপনিও নাকি ফিরে আসতে রাজি হয়েছিলেন।
সুচিত্রাঃ আমাকে নিয়ে ছবি করতে তো অনেকেই চায়। হ্যাঁ, উনি আমার ভাল বন্ধু। যোগাযোগ আছে। নানা রকম কথা হয়। তার মানে এই নয় যে আবার অভিনয়ে নামতে হবে। একটা গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। কাগজে খবরও বেরিয়েছিল। কিন্তু তা যে সত্যি নয়, তা তো এতদিনে সবাই জেনেই গেছে। উনি একবার বলেছিলেন, সত্যিই কি ছবি করবেন না? আমি মজা করে বলেছিলাম, আপনি বললেই করব। উনি বুঝেছিলেন, ওটা আমার রসিকতাই ছিল। এটা বোঝেন বলেই আর দশজনের থেকে উনি আলাদা।
আমিঃ আপনি নাকি সত্যজিৎ রায়কেও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন !
সুচিত্রাঃ তোমার পনেরো মিনিট কিন্তু আগেই ফুরিয়ে গেছে। তুমি আবার পুরনো কথা টেনে আনছো কেন? একটু পড়াশোনা কর। এসব কথা সবাই জানে। উনি একজন বরেণ্য পরিচালক। তাঁর সম্পর্কে এভাবে বলা ঠিক নয়।

আমিঃ উত্তম কুমারকে মিস করেন?
সুচিত্রাঃ সবাই করে।
আমিঃ উত্তম নেই বলেই কি নিঃশব্দে সরে গেলেন?
সুচিত্রাঃ উত্তম কবে মারা গেছে? আমি কবে ওর সঙ্গে শেষ ছবি করেছি? এগুলো আগে জানো। আমার প্রণয়পাশা দেখেছো ?
আমিঃ না, দেখা হয়নি। ওটাই নাকি আপনার শেষ ছবি?
সুচিত্রাঃ আবার নাকি! তোমরা কি কিছুই পড়াশোনা কর না? ইন্টারভিউ করতে চলে এসেছো? ওই ছবিটা দেখলে বুঝতে। আমার মনে হয়েছিল, নিজের সেরাটা দিতে পারিনি। এবার সরে যাওয়াই ভাল। তারপর থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। উত্তম মারা গেছে তারও দু'বছর পরে।

আমিঃ পারফর্মারের জীবনে চড়াই উতরাই তো আসেই। তাই বলে কি সরে যেতে হবে? ঘুরে দাঁড়ানোও তো একটা চ্যালেঞ্জ।

সুচিত্রাঃ শুধু এটাই চ্যালেঞ্জ? মাথা উঁচু রেখে সরে যাওয়াটা চ্যালেঞ্জ নয়?

আমিঃ আর কি কোনওদিন বাইরে বেরোবেন না ?

সুচিত্রাঃ আগে নানা জায়গায় ইচ্ছেমতো গেছি। কখনও ভোর বেলায় বেলুড় মঠে গেছি। কখনও কাছের মানুষদের বাড়িতেও গেছি। কেউ টের পায়নি। হাসপাতালে যেতে হল। সেখানেও মিডিয়ার ভিড় লেগে গেল। তাই আর হাসপাতাল যেতেও ইচ্ছে করে না। ওখানে কি মেলা হয় নাকি? এত ভিড় করার কী আছে?

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, তোমার পনেরো মিনিট অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। অনেক কথা হয়েছে। এখানেই থাক।

আমিঃ ম্যাডাম, এখনও যে অনেক প্রশ্ন ছিল।

সুচিত্রাঃ কথা ছিল পনেরো মিনিট। সেটা হয়ে গেছে। প্লিজ, এবার স্টপ করো।

আমিঃ একটা ছবি তুলব?

সুচিত্রাঃ না। আমার এই ছবি বেরোক, তা আমি চাই না।

আমিঃ নইলে কেউ বিশ্বাস করবে না আপনি ইন্টারভিউ দিয়েছেন।

সুচিত্রাঃ তোমার কথায় যদি লোকে বিশ্বাস না করে, তার জন্য নিশ্চয় আমি দায়ী নই। সেটা তোমার সমস্যা।

ক্যামেরা বের করলাম। হাতের সামনে সুচিত্রা। ছবি না তুললে কেউ বিশ্বাস করবে? ক্লিক করতে গেলাম। উনি চিৎকার করে বললেন, ‘প্লিজ স্টপ। আই সে, স্টপ প্লিজ।’ বলেই ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন।

আমি কী করব ভেবে না পেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে মনে হল, এবার চলে যাওয়াই ভাল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম। এমন একটা ইন্টারভিউ। কেউ বিশ্বাসও করবে না।

এতক্ষণ যাঁরা কষ্ট করে পড়ছেন, নিশ্চয় তাঁদেরও বিশ্বাস হচ্ছে না। না হওয়ারই কথা। ভাবছেন, বানিয়ে বানিয়ে লিখছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, বছর খানেক আগে আমি সত্যিই এমন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম।

সুচিত্রা স্পেশ্যাল

বেঙ্গল টাইমস

১৭ জানুয়ারি, ২০২৬

নায়িকা সংবাদ

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in